HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ০১ বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: প্রত্নতত্ত্বের ধারণা এবং এর উৎস
টপিক ০২: প্রত্নতত্ত্বের সময়কালের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণিবিভাগ
টপিক ০৩: প্রাচীন প্রস্তর যুগ
টপিক ০৪: সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব
টপিক ০৫: সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব
টপিক ০৬: ব্রোঞ্জ যুগ
টপিক ০৭: তাম্র যুগ
টপিক ০৮: লৌহ যুগ
টপিক ০৯: সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান
টপিক ১০: বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান
টপিক ১১: অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা
টপিক ১২: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৩: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: প্রত্নতত্ত্বের ধারণা এবং এর উৎস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রত্নতত্ত্বের ধারণা এবং এর উৎস

খনন কাজ থেকে উদ্ধারকৃত হাতিয়ার, তীর, ধনুক, স্থাপত্য, ঘরবাড়ি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবসমাজ সম্পর্কে গবেষণার বিষয় হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব। অতীত যুগের মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সে যুগের মানুষের সমীক্ষা বা অধ্যয়নই হলো প্রত্নতত্ত্ব। এককথায় প্রাগৈতিহাসিক বা বিলুপ্ত সংস্কৃতির অধ্যয়নই হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব। বলা হয়ে থাকে প্রত্নতত্ত্বের কল্যাণে সমাজ বিবর্তন, ধর্মীয় অনুভূতি ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

Archaeology এসেছে গ্রিক শব্দ 'Archaeos' এবং 'Logia' থেকে। যাদের অর্থ যথাক্রমে 'প্রাচীন' এবং 'অধ্যয়নরত পাঠ'। সুতরাং শব্দগতভাবে Archaeology মানে হলো প্রাচীন অধ্যয়ন বা পাঠ।

ই. বি টেইলর বলেন, “প্রত্নতত্ত্ব হচ্ছে অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত পাঠ বা গবেষণা (Archaeology is the study of remains of the past.)"

তিনি আরও বলেন, “প্রত্নতত্ত্ব নৃবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা এমন সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করে, সে সমাজের অস্তিত্ব আর নেই (Archaeology is the branch of Anthropology that is concerned with the historical reconstruction of cultures no longer contant.)"

প্রত্নতত্ত্বের ধারণা এবং এর উৎস

জগদ্বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ডের ভাষায় প্রত্নতত্ত্ব প্রাচীন মানুষের আংশিক পরিচয় দেয় না, প্রাচীন মানুষের জীবনযাত্রার রেখাচিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

প্রত্নতত্ত্ব খননকার্যের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত মানবজাতির দৈহিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকে। এজন্য প্রত্নতত্ত্বকে দৈহিক ও সাংস্কৃতিক উভয় নৃবিজ্ঞানেরই উপশাখা বলে অভিহিত করা হয়। প্রত্নতত্ত্ব জীবাশ্ম আবিষ্কার এবং এদের শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ব বলতে জ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা বোঝায় যা প্রাগৈতিহাসিক বা তারও আগের যুগের মানুষের বাস্তব সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তখনকার সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান সরবরাহ করে থাকে।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ হাজার হাজার বছর পূর্বের প্রাণী ও গাছপালার জীবাশ্ম এবং তখনকার মানুষের ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করেন। তারা এগুলো অত্যন্ত যত্নসহকারে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেন। অতীতের প্রাণী ও গাছপালার জীবাশ্ম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এগুলো ব্যবহারের কাল ও তখনকার সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ কাল নির্ণয়ে এবং তখনকার সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা যাচাইয়ে প্রত্নসম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সাধারণত Radio Carbon Dating Technique এবং Radio Acitive Potassium Technique-এর সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন।

প্রত্নতত্ত্বের ধারণা এবং এর উৎস

প্রত্নতত্ত্বের উৎস

প্রত্নতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের ইতিহাস খুঁজে বের করা। এসব তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্নতত্ত্বের বেশকিছু উৎস রয়েছে। নিচে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো-

১.দলিল-দস্তাবেজ প্রত্নতাত্ত্বিকরা লিখিত দলিল-দস্তাবেজকে প্রত্নতত্ত্বের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেন। যেমন-মেসোপটেমিয়া, মিশর ও গুয়েতেমালায় প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থও প্রত্নতত্ত্বের উত্তম উৎস হিসেবে কাজ করে।

২. প্রাচীন মানুষের কর্মকাণ্ড: পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে কোনো লিখিত ভাষার অস্তিত্ব ছিল না। যেহেতু প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো লিখিত দলিল নেই, সেজন্য প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মানুষের কর্মকাণ্ডের যেকোনো একটি ক্ষুদ্র অংশ যেমন- হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, মাটির পাত্র, জীবজন্তুর হাড়, লতা-গুল্ম, লোহা, পাথর ইত্যাদির অংশবিশেষ গবেষণার সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেন।

প্রত্নতত্ত্বের ধারণা এবং এর উৎস

প্রত্নতত্ত্বের উৎস

৩. জীবজন্তুর জীবাশ্ম: প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জীবজন্তুর হাড়, কাঠ-কয়লা এবং গাছপালার অবশিষ্টাংশ সংরক্ষণ করেন প্রত্নতাত্ত্বিক কাল নিরূপণ করার জন্য এবং পূর্বোক্ত পরিবেশগত অবস্থা যাচাইয়ের জন্য। প্রত্নতাত্ত্বিক কাল নিরূপণের জন্য তেজস্ক্রিয় অঙ্গার কৌশল (Radio carbon dating technique) ও তেজস্ক্রিয় পটাশিয়াম পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

৪ . নৃবিজ্ঞানের সহায়তা: সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ও দৈহিক নৃবিজ্ঞানীর তথ্যাদিও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস হিসেবে বিবেচিত। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা যেখানে বর্তমানের জীবিত মানবগোষ্ঠীকে নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত, সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অতীতের বিকাশমান মানবসংস্কৃতি এবং মানবের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত কাহিনি খুঁজে বের করতে চান। ফলে দৈহিক নৃবিজ্ঞানের সাথেও রয়েছে এর যোগসাজশ; কারণ জীবাশ্ম নিয়েও তাকে গবেষণা করতে হয়। এদিক থেকে প্রত্নতত্ত্ব দৈহিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যে একটি বিশ্বস্ত সেতুর মতো কাজ করে।

৫. স্মৃতিফলক: প্রত্নতত্ত্বের উৎস হিসেবে স্মৃতিফলকের ভূমিকা অপরিসীম। প্রত্নতত্ত্বের প্রধান উৎস হলো মানুষের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে বের করা। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস সম্পর্কে ধারণার পাওয়ার জন্য মানুষ বিভিন্ন স্মৃতিফলক ব্যবহার করে থাকেন। যেমন- বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থ। এছাড়া জীবজন্তুর হাড়, কাঠ-কয়লাসহ জাদুঘর গ্রন্থাগার, জাতীয় আর্কাইভ ব্যবহার করে থাকেন, যা প্রত্নতত্ত্বের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রত্নতত্ত্বের ধারণা এবং এর উৎস

প্রত্নতত্ত্বের উৎস

৬ . মুদ্রা ব্যবস্থা: প্রাচীন মুদ্রার সমাজ ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম। লিখিত ইতিহাসের অভাবের কারণে মুদ্রার ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রাচীন ভারতে এমন অনেক রাজা ছিলেন যাদের নাম আমরা মুদ্রা থেকে জানতে পারি। সাহিত্য থেকেও আমরা যে তথ্য পাই, তা মুদ্রার দ্বারা যাচাই করতে পারি। মুদ্রার গুণগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষ থেকে সমকালীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। দুটি দেশের মুদ্রার তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা জানা যায়। মুদ্রার প্রাপ্তির স্থান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা জানা যায়। মুদ্রার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে, কোন রাজার সময় তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল। মুদ্রা তৈরি হতো মূলত তামা, রূপা, সোনা প্রভৃতি ধাতু দিয়ে। তাই বলা যায়, প্রাচীন মুদ্রার প্রত্নতত্ত্বের উৎস হিসেবে মুদ্রার ভূমিকা অপরিসীম।

৭. স্থানীয় মানুষের ধারণা: কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের ধারণা বা জ্ঞানও প্রত্নতত্ত্বের উৎসের মধ্যে পড়ে। যেকোনো কিছু সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে স্থানীয় মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা নেওয়া যায়।

৮. সরকারি উৎসাদি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানও প্রত্নতত্ত্বের উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে যাদুঘর, গ্রন্থাগার, জাতীয় আর্কাইভস ইত্যাদি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ০২ প্রত্নতত্ত্বের সময়কালের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণিবিভাগ

টপিক ০২: প্রত্নতত্ত্বের সময়কালের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণিবিভাগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

প্রত্নতত্ত্বের সময়কালের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণিবিভাগ

মানবসমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে চিহ্নিত করার জন্য ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও নৃতাত্ত্বিকগণ সামাজিক বিবর্তনের পর্যায়সমূহকে চিত্রিত করেছেন। বিভিন্ন সমাজের বা যুগের জীবিকা উপার্জন বা উৎপাদন কৌশল হতে সেই যুগের নামকরণ করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে কখন, কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়টি প্রাধান্য পায় তার ওপর ভিত্তি করে সেই যুগের বা সমাজের নামকরণ করা হয়। প্রত্নতত্ত্বের সময়কালের ওপর ভিত্তি করে মানবসমাজকে বেশ কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

১. প্রস্তর যুগ (Paleolithic age)
২. প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Early or lower Paleolithic age)
৩. মধ্যপ্রস্তর যুগ (Middle Paleolithic age)
৪. নব্য প্রস্তর যুগ (Neolithic age)
৫. ব্রোঞ্জ যুগ (Bronze age)
৬. তাম্র যুগ (Copper age)
৭. লৌহ যুগ (Iron age)

প্রত্নতত্ত্বের সময়কালের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণিবিভাগ

সময়কাল অনুযায়ী প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো–

নং	ভূতাত্ত্বিক যুগ	প্রত্নতাত্ত্বিক যুগ	সময় (শুরু – শেষ)	মানবপ্রজাতি
১	প্লাইস্টোসিন (Pleistocene)	নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগ	৬,০০,০০০ – ১,০০,০০০	পিকিং, জাভা, নিয়ানডারথাল
		মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ	১,০০,০০০ – ৩০,০০০	পিকিং, জাভা, নিয়ানডারথাল
		উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ	৩০,০০০ – ১০,০০০	পিকিং, জাভা, নিয়ানডারথাল
২	হোলোসিন (Holocene)	নব্য প্রস্তর যুগ	৭০,০০০ বছর পূর্বে	আধুনিক মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo Sapiens)
		ধাতু যুগ : তাম্র যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগ	খ্রিষ্টপূর্ব ৪,০০০ – ১,৫০০ অব্দে শুরু	আধুনিক মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo Sapiens)

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ০৩ প্রাচীন প্রস্তর যুগ

টপিক ০৩: প্রাচীন প্রস্তর যুগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রাচীন প্রস্তর যুগ

প্রাচীন প্রস্তর যুগের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Paleolithic Age. Paleolithic শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ Paleo এবং Lithos শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। Paleo শব্দের অর্থ হচ্ছে পুরাতন এবং Lithos শব্দের অর্থ হচ্ছে পাথর। প্রস্তর যুগের প্রথম পর্যায় হচ্ছে প্রাচীন প্রস্তর যুগ। প্রস্তর যুগের মধ্যে এটি সবচেয়ে দীর্ঘ। প্রাথমিকভাবে প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময়কাল ধরা হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব পনেরো লক্ষ থেকে দশ লক্ষ অব্দ পর্যন্ত। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণাদির অভাবে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এ যুগের সময়কাল সংক্ষিপ্ত করে এক লক্ষ থেকে দশ হাজার অব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। প্রাচীন প্রস্তর যুগেই মানবসভ্যতার বিকাশের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রাচীন প্রস্তর যুগকে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ

প্রাচীন পর্যায়

খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ছয় লক্ষ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব এক লক্ষ অব্দ পর্যন্ত সময়কালকে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রাথমিক পর্যায় বা নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। জার্মানির হাইডেলবার্গ মানব হচ্ছে এ যুগের অন্যতম জীবাশ্ম। প্রাচীন প্রস্তর যুগের এ পর্যায়ের মানুষদের 'প্রায় মানুষ' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এরা বুদ্ধি, মেধায় ও দক্ষতায় নিম্নমানের ছিল। এ যুগের মানুষেরা অরণ্য আর গুহায় বাস করত। বন-বনান্তরে ঘুরে বেড়াত খাদ্য অন্বেষণের জন্য। ধীরে ধীরে তারা মেধা, অভিজ্ঞতা আর দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পাথর ঘষে সুচালো আর তীক্ষ্ণ করে পশু শিকারের কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। এ যুগের মানুষ ছিল প্রধানত শিকারি ও খাদ্য সংগ্রহকারী। তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ আগুনের ব্যবহার জানত বলে অনেকে ধারণা করেন। পৃথিবীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শীতল যুগে এদের অস্তিত্ব ছিল। এ যুগের অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম হলো ইন্দোনেশিয়ার জাভা মানব এবং চীনের পিকিং মানব।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ

মাধ্যমিক পর্যায়

খ্রিষ্টপূর্ব এক লক্ষ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ত্রিশ হাজার অব্দ পর্যন্ত সময়কালকে প্রাচীন প্রস্তর যুগের মাধ্যমিক পর্যায় বা মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ বলে অভিহিত করা হয়। এ যুগের মানুষেরা লজ্জা ঢাকার জন্য মৃগচর্ম পরিধান করতে শেখে। তারা শিকারের উপযোগী পাথরের ধারালো সূক্ষ্ম ও মসৃণ অস্ত্রশস্ত্র যেমন- দুপ্রান্ত তীক্ষ্ণ বর্শা, ছুরি, চাঁছাড়, তিন কোনা, চার কোনা আকৃতির অস্ত্র ইত্যাদি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এরা শীতের তীব্রতা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য পশুর চামড়া পরিধান এবং গুহায় বসবাস করত। এ যুগের মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত। এ যুগের উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী নিয়ানডারথাল বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে বসবাস করত। এ যুগের গুহাচিত্র তখনকার ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিল্পবোধের পরিচয় বহন করে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ

শেষ পর্যায়

খ্রিষ্টপূর্ব ত্রিশ হাজার অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব দশ হাজার অব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায় বা উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ। এ পর্যায়ে এসে মানুষেরা শেষ হিমশীতল যুগের কঠিন বাস্তবতাকে মোকাবিলা করতে শেখে। এ যুগের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারগুলো ছিল বর্শা নিক্ষেপ যন্ত্র, হারপুন, তীর-ধনুক ও হাড়ের তৈরি সুচ, চাকু, করাত, আল, বড়শি, বাটালি, কাঠ খোদাই ও অন্যান্য হস্তশিল্প ইত্যাদি। তীর-ধনুক ও হাড়ের তৈরি হারপুন দ্বারা পশু শিকার অনেকটা সহজ হয়েছিল। ক্রোম্যাগনন নরগোষ্ঠী হচ্ছে এ যুগের উল্লেখযোগ্য বাসিন্দা। স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্সের গুহায় এ যুগের নিপুণ শিল্পকর্মের নিদর্শন মিলেছে। অনেকেই মনে করেন, এ যুগের মানুষ গুহাচিত্রে রঙের ব্যবহার করত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ০৪ সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

টপিক ০৪: সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ যুগের বিভিন্ন আবিষ্কার, খাদ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, হাতিয়ার তৈরি, বাসস্থান নির্মাণ, বস্ত্র পরিধান করতে শেখা, আগুন আবিষ্কার, আগুন প্রজ্বলন ও এর স্থায়িত্ব রক্ষার কৌশল উদ্ভাবন, কথা বলার কৌশল উদ্ভাবন, সংগঠিত হয়ে চলাফেরা করা, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিল্পকলা ইত্যাদি সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে অনস্বীকার্য ভূমিকা রাখে। নিচে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব আলোচনা করা হলো-

জীবিকা ও খাদ্য সংগ্রহ: প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করতে পারত না বলে খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতির মধ্য থেকেই তারা খাদ্য আহরণ করত। তারা ফলমূল সবজিভোজী ছিল। তারা বন-বনান্তরে ঘুরে বড় বড় পশু যেমন হাতি, জেব্রা, হরিণ, ঘোড়া, বন্যশূকর এবং ছোট ছোট পশুপাখি, খরগোশ, বনমোরগ, হাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি শিকার করত। মূলত শিকারই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। এ যুগের অসংখ্য হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র, পশুপাখির পরিত্যক্ত হাড় ও কঙ্কাল ইত্যাদির ভিত্তিতে এ যুগের মানুষ দক্ষ শিকারি ছিল বলে ধারণা করা হয়। এ যুগের - মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করত। তখন তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বিদ্যমান ছিল না। এজন্য দলবদ্ধভাবে তারা যা শিকার করত তা সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খেত। ফলমূল, লতাগুল্ম, শাকসবজি, পাখির ডিম, কীটপতঙ্গ, - ছোটবড় জীবজন্তুর মাংস, শামুক, ঝিনুকসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদি তখনকার মানুষের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষদিকে তারা নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরা শুরু করে। আগুন আবিষ্কারের পর এ যুগের মানুষ খাদ্য আগুনে ঝলসে খেতে শুরু করে।

সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

বাসস্থান : প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল যাযাবর প্রকৃতির। খাদ্য সংগ্রহের জন্য তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। এজন্য তারা যখন যে অঞ্চলে যেত সে অঞ্চলেই আবাসস্থল গড়ে তুলত। এ যুগের মানুষ কখনো বনাঞ্চল, কখনো নদী বা সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে, কখনো পর্বতসংকুল এলাকা আবার কখনো জলাভূমিতে বাসস্থান তৈরি করেছে। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ের গুহায়, গাছের ডালে, গাছের কোটরে, মাটির গর্তে ইত্যাদি স্থানে বসবাস করেছে। পিকিং, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, নিউ মেক্সিকোর সান্দিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে ক্রোম্যাগনন, পিথেক্যান্ত্রাপাস, নিয়ানডারথাল ইত্যাদি নরগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। ডন, ডসনা ইত্যাদি নদীর উপকূল, সাইবেরিয়া ও মাল্টায় প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের গর্ত খুঁড়ে কুঠুরিতে বসবাস করার নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ে মানুষ আরেকটু উন্নতমানের ঘর তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করেছিল। মানুষ প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল ছেড়ে ধীরে ধীরে পশুর চামড়া, তাঁবু, লতাপাতা, কাঠ, মাটি দিয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ঘরবাড়ি তৈরি করতে শুরু করে। চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ের শিকারিদের ঘরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এ ঘর ছিল অনেকটা তাঁবুর মতো।

সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

পোশাক-পরিচ্ছদ: প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ উলঙ্গ থাকত। কিন্তু এ যুগের শেষ পর্যায়ে মানুষ পশুর চামড়া দিয়ে শীত থেকে বাঁচার জন্য শরীর আবৃত করার কৌশল আয়ত্ত করেছিল। লজ্জা নিবারণের জন্য প্রথমদিকে মানুষ গাছের ছাল, বাকল, পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করত। পরে ধীরে ধীরে তারা পশুর চামড়া গায়ে জড়ানোর কৌশল শেখে। তারপর তারা চামড়াকে শরীরের মাপে সেলাই করে নিতে শেখে। সেলাইয়ের জন্য তারা হাড়ের তৈরি সুচ গাছের বাকল দিয়ে তৈরি সুতা ব্যবহার করত। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে তারা শরীরের বিভিন্ন অংশে মাটি, পাথর, হাড় ইত্যাদির তৈরি বিভিন্ন গহনা ব্যবহার করত। তখনকার সময়ে নারী-পুরুষ সবাই গহনা পরিধান করত।

সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

ব্যবহার্য হাতিয়ার: প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করত। হাতিয়ারগুলো ছিল মূলত পাথরের তৈরি। কখনো সম্পূর্ণ পাথর খণ্ডটিই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কখনো এ হাতিয়ারগুলোকে নিজেদের সুবিধামতো আকার-আকৃতি দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। হস্তকুঠার, শাবল, ছুরি, করাত, হারপুন, বড়শি, চাকু, তীর-ধনুক ইত্যাদি ছিল এ যুগের প্রধান হাতিয়ারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ যুগের মানুষ পাথরের তৈরি হাতিয়ারের পাশাপাশি বাঁশ, গাছের ডাল, পশুর হাড়, দাঁত, শিং ইত্যাদির তৈরি হাতিয়ারও ব্যবহার করত। তবে প্রাচীন প্রস্তর যুগের গোড়ার দিকের হাতিয়ারগুলো নিতান্তই পাথরের টুকরা বলে কোনো কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদ সন্দেহ করেছেন। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে মানুষ কারিগরি দক্ষতার মাধ্যমে এক খণ্ড মূল পাথর থেকে পাতলা পরত খসিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে শিখে। এ ধরনের হাতিয়ারকে বলা হতো মূল পাথরের হাতিয়ার। এ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অস্ত্র হচ্ছে তীর-ধনুক। এভাবে ধীরে ধীরে তারা একটু উন্নতমানের হাতিয়ার তৈরি ও এর ব্যবহার আয়ত্ত করেছিল। জার্মানিতে একটি হাতির কঙ্কালের মধ্যে গাঁথা অবস্থায় একটি কাঠের বল্লম পাওয়া গিয়েছে। শুধু শিকারের জন্য নয়, আত্মরক্ষার জন্যও তারা এসব হাতিয়ার ব্যবহার করত। তীর-ধনুকের সাহায্যে এ যুগের মানুষ আকাশের উড়ন্ত পাখিও শিকার করতে সক্ষম হয়েছিল।

সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

আগুন আবিষ্কার: সভ্যতার বিকাশে উল্লেখযোগ্য একটি আবিষ্কার হচ্ছে আগুনের আবিষ্কার। তবে আগুন আবিষ্কারের সঠিক সময় সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে পিকিং মানুষের আগুনের ব্যবহার সম্পর্কে চীনের চাউ কু তিয়েন অঞ্চলের গুহা থেকে জানা যায়। তাছাড়া আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ আগুন তৈরি করতে জানত না বলে বাইরে থেকে আগুন নিয়ে এসে গুহার মধ্যে জ্বালিয়ে রাখত এবং অবিরাম জ্বলত এ আগুন। কিন্তু যখন মানুষ পাথরে পাথর ঠুকে বা কাঠে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালানোর কৌশল আয়ত্ত করতে শিখল তখনই তারা প্রকৃতির এক বিরাট শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিল। আগুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে নিজেই নিজের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার পথে অগ্রসর হয়। আগুন আবিষ্কারের ফলে মানুষের মধ্যে মমত্ববোধ জাগ্রত হয়। সর্বপ্রথম পাথর ঘষে আগুন আবিষ্কার করে ক্রোম্যাগনন মানুষ। সমরেন্দু নাথ সেন আগুনের আবিষ্কারকে এক বিরাট, বৈপ্লবিক ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন।

সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

সমাজব্যবস্থা: প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করত ও শিকার সংগ্রহ করত। মর্গানের মতে, মানুষ জোট বেঁধেছে জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রাচীন প্রস্তর যুগের সামাজিক জীবনের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ক্ল্যান, টোটেম, টাবু, ফাত্রি ও ট্রাইব। মানুষ আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ হয়ে বাস করত। দলবদ্ধ হয়ে বাস করার এ প্রবণতার জন্য মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। একই পূর্বপুরুষের পরিবার হতে জন্মলাভকারী ছোট ছোট দল বা ক্ল্যান এক জায়গায় বসবাস করত। এ রকম অনেকগুলো দল বা ক্ল্যান ছিল বলে দার্শনিকগণ মনে করেন। প্রধানত দুটি রীতি অনুযায়ী দল বা ক্ল্যানকে চিহ্নিত করা হয়। একই মা হতে জাত ক্ল্যান এবং একই পিতা হতে জাত ক্ল্যান। ক্ল্যানের সদস্যরা তাদের পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে স্মরণ করত। ক্ল্যান সদস্যদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে বলা হতো টোটেম। ক্ল্যান সদস্যদের পালিতব্য ধর্মীয় বিধিনিষেধ বা সতর্কবাণীকে বলা হতো ট্যাবু। যখন ক্ল্যানের সদস্যসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তাদের বর্ধিত সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে দুই বা তার চেয়ে বেশি ক্ল্যান গঠিত হতো। এরূপ নবগঠিত ক্ল্যানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হতো 'ফাত্রি'। আর কয়েকটি 'ফাত্রি' মিলে গঠিত হতো 'ট্রাইব'। ফাত্রি প্রধানদের নিয়ে গঠিত হতো ট্রাইব বা সংঘ। এ সংঘগুলো বিচার-আচারের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের মতো ভূমিকা রাখত। ক্ল্যান সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিটি ক্ল্যানে একজন করে দলনেতা নির্বাচিত হতেন।

সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

শিল্পকলা: শিল্পকলার ক্ষেত্রেও প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের স্বাক্ষর রয়েছে। এ সময় চিত্রকলা, ভাস্কর্য, খোদাই শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করে। শিল্পকলার মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল চিত্রকলা। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ গুহাচিত্র অঙ্কনে পারদর্শী ছিল। তবে এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে গুহার মাঝামাঝি স্থান অর্থাৎ যে জায়গায় মানুষ বাস করত সে জায়গায় কোনো চিত্রকর্ম পাওয়া যায়নি। এগুলো পাওয়া গেছে গুহার ভিতরে দুর্গম প্রত্যন্ত স্থানে। গুহার ভিতরে চিত্রকর্মে বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি বিশেষ করে বায়সন, বন্য ঘোড়া, বন্যশূকর, শিংবিশিষ্ট হরিণ, ষাঁড়ের ছবি, শিকারের দৃশ্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাদুবিদ্যা: তখনকার মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাদুটোনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বার্নস ও রালফ-এর মতে, "চিত্রকর শুধু একজন সুদক্ষ শিল্পীই ছিলেন না, একজন জাদুকরও ছিলেন।" প্রাচীন প্রস্তর যুগের শিল্পীরা জাদুবিদ্যার প্রভাব বাড়ানোর জন্য দুর্গম, বিপদসংকুল ও বসবাসের অযোগ্য গুহার ভিতর বেছে নিত। তাদের ধারণা ছিল, যদি শত অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও এসব বিপদসংকুল এলাকায় চিত্রকর্ম অঙ্কন সম্ভব হয় তাহলে সব অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও শিকারে সফলতা আসবে। কিন্তু তাদের চিত্রকর্মে মানুষের স্থান ছিল না বললেই চলে। কারণ তাদের ধারণা ছিল, মানুষের প্রতিকৃতি আঁকলে জীবজন্তু তা দেখে তাদের ওপর পাল্টা জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করতে পারে।

সমাজ সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

ভাস্কর্যশিল্প: খোদাই ও ভাস্কর্যশিল্পেও এ যুগের মানুষ অগ্রগতি সাধন করেছিল। ফ্রান্সের Less Roc এ একটি পাথরে খোদাই শিল্পে একটি শূকরকে বন্য ঘোড়া তাড়া করার দৃশ্য তার অন্যতম একটি উদাহরণ। খোদাই শিল্পের মধ্যে হাড় ও হাতির দাঁত, হরিণের শিং ইত্যাদিতে বিভিন্ন নকশা বিশেষ করে শিকারের দৃশ্য অঙ্কন ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের চিত্রকলার মধ্যে নারীর অলঙ্কারও স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে পুঁতির মালা, দাঁতের তৈরি শিরাবরণ, বালা, গলার হাড়, বাজুবন্ধ, কোমরবন্ধ, হাঁটুবন্ধ, ঝুমকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উদ্ধারকৃত ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে বেশকিছু নারীমূর্তিও রয়েছে। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা ও ফ্রান্সের জাদুঘরগুলোতে এ চিত্রকর্মগুলো সংরক্ষিত রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ০৫ সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

টপিক ০৩: সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। কৃষিকাজ, পশুপালন, তামা ও চাকার আবিষ্কার, কৃষি যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, গৃহনির্মাণে স্বকীয়তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি, নতুন পেশাজীবীর উদ্ভব, নৌযানের আবিষ্কার, বিনিময় প্রথা চালু, সমাজকাঠামো ও প্রশাসনিক অগ্রগতি, ভাষা শিক্ষা তথা লেখার আবিষ্কার, শিল্পকলা চর্চা, ধর্মীয় জীবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষেরা অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিল। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে এ যুগের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিবেচনায় রেখে এ যুগকে নবোপলীয় বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

নচে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব আলোচনা করা হলো-

কৃষির সূত্রপাত: মানুষের জীবনের উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিপ্লব হচ্ছে কৃষির সূত্রপাত। প্রাচীন প্রস্তর ও মধ্য প্রস্তর যুগের খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ নব্য প্রস্তর যুগে খাদ্য উৎপাদনকারী মানুষে পরিণত হয়। নব্য প্রস্তর মানুষ শস্যাদি উৎপাদনের পাশাপাশি বিভিন্ন বন্য পশুপাখিকেও গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করেছিল। তবে পশুপালন ও কৃষিকাজের মধ্যে কোনটা আগে করেছিল তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কারও কারও মতে কৃষিকাজটির উদ্ভব হয়েছে পশুপালনের আগে। কিন্তু জার্মান ঐতিহাসিকদের মতে, যখন কিছু মানবগোষ্ঠী একদিকে কৃষিকাজ শুরু করেছিল, অন্যদিকে অন্য একটি মানবগোষ্ঠী জীবজন্তুকে পোষ মানিয়েছিল। কিন্তু কোনটি আগে শুরু হয়েছে তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। কৃষির উৎপাদন কখন, কোথায় প্রথম শুরু হয়েছে তাও সঠিকভাবে এ পর্যন্ত জানা যায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, গম ও বার্লি হচ্ছে প্রাচীনতম কৃষিজাত ফসল।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

মহিলারা জ্বালানি ও ফলমূল সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকত। কোনো এক সময় ফলমূলের সাথে সংগ্রহ করে আনা বার্লি বা গমের বীজ কোনো এক আর্দ্র জায়গায় পড়ে সেখান থেকে চারা অঙ্কুরিত হয়। সম্ভবত ওই চারাগুলো থেকে প্রচুর ফল উৎপাদনের দৃশ্য দেখেই কৌতূহলবশত মহিলারা বাড়ির আশপাশে চারা জন্মাবার ব্যবস্থা করে। এভাবেই কৃষিবিপ্লবের সূত্রপাত। কৃষির মধ্যে গম ও বার্লির চাষ প্রাচীনতম। এ দুটি শস্য উচ্চ ফলনশীল, পুষ্টিকর, সহজে সংরক্ষণযোগ্য এবং কম খরচে উৎপাদনযোগ্য। বাইবেলে উল্লেখ আছে- যে উদ্যানে হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) বাস করতেন সেই উদ্যানে প্রথম গমের চাষ হয়েছিল। এ উদ্যানটি ইডেন উদ্যান নামে পরিচিত। গম ও বার্লি ছাড়াও নব্য প্রস্তর যুগে ধান, রাই, যব ইত্যাদির চাষও হয়েছিল।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

পশুপালনের সূত্রপাত: মানবসভ্যতার বিকাশে কৃষির মতো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে পশুপালন। বন্য পশুকে পোষ মানানোর মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব শুরু করে। তবে কখন, কীভাবে মানুষের মাথায় বন্যপশুকে পোষ মানানোর মাধ্যমে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করার পরিকল্পনা এসেছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্য প্রস্তর যুগে কুকুরকে পোষ মানানো হয়েছিল। কুকুর নিজের প্রয়োজনেই মানুষের সান্নিধ্যে এসেছে। মানুষের সঙ্গী হয়েছে। শিকারিকে কুকুর বিপদসংকেত দিয়ে মানুষকে সাহায্য করত। সে শিকারের পরিত্যক্ত খাবার খেয়ে বেঁচে থাকত। এজন্য মানুষও খুব সহজে কুকুরকে গ্রহণ করেছিল। তাছাড়া ছাগল, শূকর, ভেড়া, মহিষ, গাধা, ঘোড়া ইত্যাদিকেও মানুষ খুব সহজেই পোষ মানিয়েছিল। তবে বন্যপশুকে পোষ মানাতে তখনকার মানুষের বেশকিছু সময় লেগেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিকারের সময় শিকারিদের হাতে কিছু কিছু দুর্বল পশু শাবক ধরা পড়ত। এ পশু শাবকগুলোকে তারা হত্যা না করে অন্য কাজে ব্যবহার করত। ধীরে ধীরে এ পশুগুলো বড় হতে থাকে ও পোষ মানতে শুরু করে। এদের মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, মেসোপটেমিয়া, মিসর ও পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে পশুপালনের সূত্রপাত ঘটে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

বাসস্থান নির্মাণে পারদর্শিতা নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ গুহাবাস ছেড়ে গাছের ডালপালা, বাকল, পত্রপল্লব, তৃণ, লতাপাতা ইত্যাদি দিয়ে কুঁড়েঘর তৈরি করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে যখন কৃষিকাজ শুরু হয় তখনই মানুষ গৃহনির্মাণ করতে শেখে। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষেরা দুই ধরনের বাড়ি তৈরি করত। প্রথমত, মানুষ বড় বড় পাথর মাটির চারদিকে পুঁতে তার চারদিকে পাথর বা কাঠের দেয়াল দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করত। এ ধরনের বাড়ি হিংস্র জানোয়ার বা অন্যান্য শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য উপযোগী ছিল। নব্য প্রস্তর যুগে বেশিরভাগ বাড়িই ছিল এ ধরনের। দক্ষিণ আনাতোলিয়া, জর্ডানের জেরিকো, নীলনদ তীরবর্তী গ্রাম ইত্যাদি স্থানে এ ধরনের বাড়ির নিদর্শন পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়ত, এ যুগের মানুষেরা জলের ওপর খুঁটি গেড়ে ঝুলন্ত বাড়ি নির্মাণেও পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছিল। বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেমন ইংল্যান্ড, জার্মানি, সুইজারল্যান্ডে হ্রদের জলের নিচে কাঠের গুঁড়ি পুঁতে তার উপর কাঠের পাটাতন দিয়ে খুব শৌখিন বাড়ি তৈরি করা হতো। নব্য প্রস্তর যুগে মধ্য এশিয়ার ঘরগুলো ছিল ঘাসের চাপড়া ও পরস্পর বিজড়িত লম্বা গাছ দিয়ে তৈরি। বর্তমানেও এ এলাকায় এ ধরনের বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপের কোনো কোনো অঞ্চলে আয়তাকার কাঠের বাড়ির নিদর্শন পাওয়া গেছে, যার ছাদগুলো ত্রিকোণাকৃতির আর দেয়ালগুলো ছিল ছোট ছোট গাছের টুকরা দিয়ে তৈরি।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

হাতিয়ার তৈরিতে পারদর্শিতা নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ উন্নতমানের হাতিয়ার তৈরিতে পারদর্শী ছিল। হাতিয়ার তৈরিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্যই এ যুগকে বলা হয় নব্য প্রস্তর যুগ। এ যুগের হাতিয়ারগুলো যথেষ্ট তীক্ষ্ণ, মসৃণ ও ধারালো। এ যুগেই হাতিয়ারের মধ্যে হাতল লাগানোর প্রচলন শুরু হয়। মিসর, ইরান, উত্তর ইরান, প্যালেস্টাইন, তুরস্ক, আনাতোলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। ভারত ও পাকিস্তানের কিছু কিছু এলাকায়ও নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ যুগের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ারগুলো হচ্ছে চাকু, কাস্তে, কুঠার, কোদাল, গাঁইতি, বর্শা, তীর ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এ যুগের মানুষেরা বাটালি, ছেনি ইত্যাদি ব্যবহার করত। কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হতো গর্তকারী লাঠি, গাঁইতি, কোদাল, নিড়ানি ইত্যাদি। লাঙলের ব্যবহারও নব্য প্রস্তর যুগেই শুরু হয়েছিল।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

মৃৎপাত্র আবিষ্কার: নব্য প্রস্তর যুগের গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার হচ্ছে মৃৎপাত্র। কৃষি ব্যবস্থারই অনিবার্য ফল হচ্ছে মৃৎশিল্প। গর্ডন চাইল্ডের মতে খাদ্য উৎপাদনের অর্থনীতির উত্থানের আগেই মৃৎশিল্পের আবিষ্কার হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় কাদামাটির তৈরি ছোট ছোট মাটির পাত্র ছিল মাপবিহীন। চাকা আবিষ্কৃত হওয়ার পরে এটিকে মাটির পাত্র নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়। কিছু লোক মৃৎশিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ, রান্না ও পরিবেশনের কাজে নব্য প্রস্তর যুগে মাটির পাত্র ব্যবহৃত হতো। কখনো কখনো মাটির পাত্রে বিভিন্ন ধরনের নকশা অঙ্কন করা হতো। গ্রাহাম ক্লার্কের মতে, নব্য প্রস্তর যুগের মাটির পাত্রের গঠনের প্রকৃতি, পোড়ার ধরন, রং ব্যবহার এবং কারুকার্য একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

চাকা আবিষ্কার: নব্য প্রস্তর যুগের উল্লেখযোগ্য একটি আবিষ্কার হচ্ছে চাকা। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে এলাম, মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ায়, খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ হাজার অব্দে তুরস্কে, খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ক্রিট ও এশিয়া মাইনরে, খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০ অব্দে মিসরে চাকার ব্যবহার শুরু হয়। সুদূর অতীতে যে উদ্দেশ্য নিয়ে চাকা আবিষ্কার করা হয়েছিল, আজ অবধি চাকা ব্যবহারের উদ্দেশ্য তাই রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সুমেরটেপ গাওয়া নামক স্থানে মাটির তৈরি দুই চাকার ও চার চাকার খেলনার সন্ধান পেয়েছেন। চাকা আবিষ্কারের ফলে সভ্যতায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে চাকা এক অভাবনীয় সাফল্য এনে দিয়েছে। বস্ত্র শিল্পের বিকাশে, যুদ্ধের সনাতন কৌশল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চাকার ভূমিকা অপরিসীম।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

আগুন জ্বালানো ও ব্যবহারের কলাকৌশল আয়ত্ত: প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ আগুন আবিষ্কার করলেও কৃত্রিম পদ্ধতিতে আগুন জ্বালানো ও ব্যবহারের কলাকৌশল আয়ত্ত করে নব্য প্রস্তর যুগে। চকমকি পাথর ছিল ওই সময়ের দিয়াশলাই। আগুন আবিষ্কারের ফলে মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। মানুষ কাঁচা মাংস খাওয়ার পরিবর্তে মাংস ঝলসে খাওয়া শুরু করে। নব্য প্রস্তর যুগে মৃৎপাত্র তৈরি, খাদ্য সিদ্ধ করা, শীত নিবারণ, বন্য হিংস্র জীবজন্ত তাড়ানো, অস্ত্র তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষ আগুনের সফল ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া আগুনের ব্যবহারের কারণে মানুষের দৈহিক পরিবর্তন ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

বয়ন শিল্পের বিকাশ: বয়ন শিল্পের বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব অপরিসীম। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মিসর ও পশ্চিম এশিয়ায় বয়ন শিল্পের নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। শনের আঁশ পাকিয়ে জোড়া দিয়ে সুতা তৈরি করা হতো। নব্য প্রস্তর যুগেই সুতা তৈরির যন্ত্র, চরকা, তাঁত ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমান বিদ্যুচ্চালিত যুগেও কোনো কোনো অঞ্চলে নব্য প্রস্তর যুগের তাঁতের বয়ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

যাযাবর জীবনের সমাপ্তি: নব্য প্রস্তর যুগে স্থায়ী বাসস্থান তৈরির মাধ্যমে মানুষের যাযাবর জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এর ফলে গ্রামের বিকাশ ঘটে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় গ্রামের উদ্ভব ঘটতে থাকে। উর্বর ভূমিকে কেন্দ্র করে গ্রামের সৃষ্টি হতো। গর্ডন চাইল্ডের মতে, তরুণদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র বাসস্থান গড়ে নতুন গ্রামের পত্তন করেছিলেন।

অলঙ্কার, সাজসজ্জা ও কেশবিন্যাস: প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ অলঙ্কার ব্যবহার করত। তারা অবসর সময়ে সাজসজ্জার দিকে নজর দিত। নারী-পুরুষ উভয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করত। মেয়েরা গলায়, হাতে ও পায়ে পুঁতির মালা, গলায় মালার সাথে লকেট ও হাতে বালা পরত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তখনকার সময়ের কয়েকটি নারীমূর্তি অবলোকন করে ধারণা পোষণ করেছেন, তারা কেশবিন্যাস করে বড় ও বিচিত্র আকারের খোঁপা পরত। নীলনদ এলাকায় নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতির দাঁতের অলঙ্কারের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি: নব্য প্রস্তর যুগের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে যুদ্ধে পরাজিতদের ভূমিদাসে পরিণত করা হতো। পরাজিত সৈনিকদের কৃষি ও পশুপালনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। গর্ডন চাইল্ডের মতে, তখন মানুষেরা পরাজিত শত্রুকে আগের মতো খাদ্যের জন্য মেরে ফেলার চেয়ে কাজে লাগান অনেক লাভজনক মনে করতে থাকে। তাছাড়া প্রাকৃতিক কারণে যারা ভূমিহীন হতো তাদের নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খাওয়া-পরার নিশ্চয়তা দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট জমিতে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হতো। এভাবে সমাজে আশ্রিত-আশ্রয়দাতা, প্রভু-ভৃত্য, শাসক-শোষক শ্রেণিসমূহ সৃষ্টি হয়। আবার রাজশক্তি, অভিজাত শ্রেণি ও ধর্মগুরুরা স্বাধীন কৃষকের উৎপাদিত ফসলে ভাগ বসাত। এভাবে সমাজে ভূমিকর, ধর্মকর, নিরাপত্তা কর নামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে থাকে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির বিকাশ: প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, নব্য প্রস্তর যুগেই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। নব্য প্রস্তর যুগের একেকটি গ্রাম ছিল একেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক ইউনিটের মতো। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য গ্রামবাসীদের অন্য গ্রামের ওপর নির্ভর করতে হতো না। নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তারা নিজেরাই উৎপাদন করতে পারত। শ্রমবিভাজন প্রথাও নব্য প্রস্তর যুগেই বিকশিত হয়। সামর্থ্য অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের সক্ষম মানুষের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হতো। নারীরা সন্তান উৎপাদন, লালন-পালন, শস্য উৎপাদন, কাপড় বোনা, মাটির পাত্র তৈরি ও গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত থাকত। পুরুষেরা অস্ত্র তৈরি, শিকার, পশুপালন, গৃহনির্মাণের কাজে নিয়োজিত থাকত। তখন সমাজে সদস্য কম থাকায় অভাবও কম ছিল। কিন্তু এর একটি নেতিবাচক দিক হচ্ছে, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যার সমাধান সম্পর্কেও কোনো চিন্তাভাবনা তখন তাদের মাথায় আসেনি।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

বিনিময় প্রথার উদ্ভব: নব্য প্রস্তর যুগের গ্রামগুলো স্বনির্ভর হলেও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য অন্য গ্রামের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হতো। যেসব শ্রমিক পাথরের খনিতে কাজ করত তারা খনি খোঁড়ার হাতিয়ার তৈরির উপাদান যেমন পশুর হাড়, শিং, কাঠ ইত্যাদির জন্য অন্য গ্রামের শিকারি, কৃষিজীবী ও পশুপালকের ওপর নির্ভর করত। এভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য, আদান-প্রদান ও বিনিময় প্রথা গড়ে ওঠে। নব্য প্রস্তর যুগে বিনিময় প্রথা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কারিগরি জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার, উন্মেষ এবং এগুলোর আদান-প্রদান ঘটায়। এভাবে নব্য প্রস্তর যুগে মানুষের বিচরণ পশ্চিম এশিয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত এশিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা: নব্য প্রস্তর যুগে কৃষিকাজ ও পশুপালন সমগ্র সমাজের দৃশ্যপটকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। কৃষির আবির্ভাবের ফলে মানুষের মধ্যে জমি, পশু, শস্যাদি ও ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন সম্পদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এজন্য ট্রাইবের সম্পত্তিকে সাধারণ সম্পদ বলে বিবেচনা করলেও পরবর্তীতে সম্পত্তির বণ্টনের মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃতি পায়। প্রয়োজনীয় কৃষি জমি, উদ্বৃত্ত ফসলের বিনিময় ও ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণেই সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা সৃষ্টি হয়। পরিবার ও বিবাহ প্রথা চালু হওয়ার পর প্রাপ্ত সম্পত্তি পরবর্তী বংশধরদের বণ্টন করার রীতি চালু হয়।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

নৌযান ও পালের ব্যবহার: নব্য প্রস্তর যুগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হচ্ছে নৌযান ও পালের ব্যবহার। তখন মানুষ স্থলপথে মাল টানার জন্য পশুশক্তি আর জলপথে মাল টানার জন্য নৌযান ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিল। প্রাচীন প্রস্তর যুগে ভেলা বা ডিঙ্গি আবিষ্কৃত হলেও নৌকায় পাল লাগানোর কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল নব্য প্রস্তর যুগে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে মিসরে প্রথম পালতোলা নৌকার প্রচলন শুরু হয়। ভূমধ্যসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও আরব সাগরে পালতোলা নৌকা চলাচল করত বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা।

ভাষার উদ্ভব: প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, নব্য প্রস্তর যুগেই ভাষার উদ্ভব ঘটে। বিনিময় প্রথা চালু হওয়ার পর নব্য প্রস্তর যুগের গ্রামবাসীরা ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দূর-দূরান্তের খবর সংগ্রহ করত। তাছাড়া নতুন নতুন কৃষিজমি অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীব্যাপী ভাবের আদান-প্রদান ঘটতে থাকে। তখন মানুষ অন্যের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাগুলো মুখের ভাষার মাধ্যমে আয়ত্ত করত। সহজে মনে রাখার জন্য তারা উপযোগী ঝংকার, ছন্দবহুল, গাঁথা, বচন ও গীতের ব্যবহার করত।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

শিল্পকলায় অবদান শিল্পকলার ক্ষেত্রেও নব্য প্রস্তর যুগের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা যেমন মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের যথেষ্ট মেধা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রয়েছে। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ মৃৎশিল্পে এগিয়ে ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মিসর, ইরাক, জারমো, ইরানের সিয়াস্ক, আনাতোলিয়া ও গ্রিসে নব্য প্রস্তর মানুষের মৃৎশিল্পের নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। প্রথমদিকে মৃৎশিল্পগুলো সাদামাটা ও নকশাবিহীন হলেও নব্য প্রস্তর যুগের শেষদিকে এগুলোতে জীবজন্তুর নকশা, জ্যামিতিক প্রতীক ও রং ব্যবহার করা হয়। সুইজারল্যান্ডের হ্রদ এলাকায় নব্য প্রস্তর যুগের কিছু মৃৎশিল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা তখনকার মানুষের রুচিশীলতার পরিচয় বহন করে। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের চিত্রকলা ছিল বাস্তব ও জীবনমুখী।

জাদুবিদ্যা ও ধর্মের উপস্থিতি এবং উপাসনা ও কুসংস্কার: জাদুবিদ্যা ও ধর্মের উপস্থিতি নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের মধ্যেও ছিল। জাদুবিদ্যা ও অলৌকিক শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমস্বরূপ এ যুগের মানুষেরা বিভিন্ন দেবদেবী ও অপদেবতার পূজা করত। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ প্রকৃতির ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল ছিল। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা, বন্যা, প্লাবন, মড়ক, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি মানুষের ফসলের ক্ষতি করত। কিন্তু এগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় মানুষের জানা ছিল না। ফলে প্রাকৃতিক অদৃশ্য শক্তির প্রতি মানুষের এক অজানা ভীতির সঞ্চার হয় এবং এ অজানা ভীতিই মানুষের মধ্যে অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণা সৃষ্টি করে। এজন্য মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন কাজকে আলাদা আলাদা শক্তি মনে করে, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করত।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

নব্য প্রস্তর যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হচ্ছে ভয়ের কারণে মানুষ ধর্ম পালন করত। তখন মানুষ এক ভীতিকর অবস্থায় বসবাস করত। মানুষের ভয় শুধু শারীরিক অসুস্থতা ও মৃত্যুই ছিল না, বরং বিভিন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝা, খরা, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মৃত মানুষ, যাদেরকে হত্যা করেছে তাদের আত্মা সম্পর্কেও মানুষের মধ্যে এক অজানা ভয় কাজ করত। এগুলো থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষ ধর্ম এবং জাদুবিদ্যার আশ্রয় নিত।

নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ বিভিন্ন অশুভ শক্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। বিপদসঙ্কুল নদী পার হওয়ার আগে তারা বেশকিছু অনুষ্ঠানাদি পালন করত।

নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ বিভিন্ন কুসংস্কারে বিশ্বাস করত। তারা সচেতন ও অচেতন সব বস্তুকে একই আঙ্গিকে বিবেচনা করত। কোনো শিশু আগুনে পুড়ে গেলে ধারণা করা হতো তাকে কেউ জাদুটোনা করেছে। এজন্য জাদুকর বা অপরাধীকে খুঁজে বের করার জন্য শিশুটির পিতামাতারা আপ্রাণ চেষ্টা করত।

নব্য প্রস্তর যুগের শেষদিকে দেবদেবীর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় এবং তাদের পূজা-অর্চনা শুরু হয়। ধারণা করা হতো, প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক স্থানীয় দেবতা ছিল, যারা বিপদে-আপদে ও যুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করত। দেবদেবীর পূজা-অর্চনার মাধ্যমে তখনকার জীবন-জীবিকার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হতো। তখন মাটিকে মা এবং ফসলকে সন্তান হিসেবে কল্পনা করা হতো। মায়ের প্রতীক হিসেবে তৈরি করা হতো বিভিন্ন নারীমূর্তি।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব

ধর্মের মধ্যে জাদুবিদ্যা ও কুসংস্কার ঢুকে পড়ায় ধর্মীয় জটিলতার সৃষ্টি হয়। পূজা-পার্বণ ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান বেড়ে যাওয়ায় এগুলো সঠিকভাবে পালনের জন্য সমাজে এক শ্রেণির ধর্মযাজকের আবির্ভাব ঘটে। এ ধর্মযাজকের ভরণপোষণের জন্য কৃষকের উদ্বৃত্ত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ তাকে দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন বিপদ-আপদের অজুহাত দেখিয়ে জাদুকরদের মতো তাদের ওপরও মানুষের বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে নতুন নতুন দেবতা ও উপাসনালয় গড়ে ওঠে। এ সুযোগে জাদুকর এবং ধর্মযাজকগণ ধীরে ধীরে শক্তিশালী ও বিত্তবান শ্রেণিতে পরিণত হয়।

মৃতদেহের সৎকার: নব্য প্রস্তর যুগের মানুষেরা মৃতদেহকে কবর দিত। কবরগুলো সাধারণত ঘরের আশপাশেই দেওয়া হতো। কখনো সম্পূর্ণ মৃতদেহকে কবর দেওয়া হতো আবার কখনো মৃতদেহ থেকে মাংস খুলে রেখে শুধু কঙ্কালটিকে কবরে রাখা হতো। মৃতদেহের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন খাদ্য, পানীয়, প্রসাধনী সামগ্রী ইত্যাদি রেখে দেওয়া হতো।

সুতরাং নব্য প্রস্তর যুগ বিভিন্ন মৌলিক আবিষ্কারে সমৃদ্ধ। এ যুগের কৃষি, পশুপালন, ঘরবাড়ি তৈরি, মৃৎশিল্প, চামড়া, বয়ন শিল্প এবং বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার সমাজ সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে অভাবনীয় তাৎপর্য বহন করে। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষই সভ্যতার সব উপকরণ ও আয়োজনকে পূর্ণ করেছে। এজন্যই গর্ডন চাইল্ড নব্য প্রস্তর যুগকে নবোপলীয় বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ০৬ ব্রোঞ্জ যুগ

টপিক ০৬: ব্রোঞ্জ যুগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ব্রোঞ্জ যুগ

৫০০ অব্দের মধ্যে পশ্চিম এশিয়ায় প্রথম ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হয়। ধীরে ধীরে ভারত, চীনসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ব্রোঞ্জের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটেনে ব্রোঞ্জ যুগের সূচনা হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৯০০ অব্দে এবং তা খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে সিরিয়ায় ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। পূর্ব ইউরোপ ও ঈজিয়ান সাগর অঞ্চলে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২২০০ অব্দে ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হয়। ব্রোঞ্জ একটি সংকর ধাতু যা তামা ও টিনের সংমিশ্রণে তৈরি।

ব্রোঞ্জ যুগ

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে ব্রোঞ্জ যুগের প্রভাব

ব্রোঞ্জ যুগে মানব প্রতিকৃতি নির্মাণে ব্রোঞ্জের কৃতিত্বপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি মানব প্রতিকৃতি থেকে এ ধারণা করা হয়। ব্রোঞ্জ যুগে ব্রোঞ্জের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ও প্রযুক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এর মধ্যে মিসরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, এসেরীয়, ক্যালিডীয়, হিটাইট, সিন্ধু, লিডীয়, পারস্য, ক্রিট, মালয়, আজটেক ও ইনকা সভ্যতা উল্লেখযোগ্য। ব্রোঞ্জ যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলি নিচে তুলে ধরা হলো-

১. ব্রোঞ্জনির্মিত হাতিয়ার: এ যুগের মানুষ ব্রোঞ্জের দ্বারা নানা ধরনের হাতিয়ার নির্মাণ শুরু করে। ব্রোঞ্জের নির্মিত বর্ম, শিরস্ত্রাণ, উরস্থান (Curass), তলোয়ার, বর্শা এবং তীর এ যুগের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার।

২. ব্যবসায় বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক রূপ: ব্রোঞ্জ যুগেই সর্বপ্রথম ব্যবসায় বাণিজ্য আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে ভূমধ্যসাগর, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে নিয়মিতভাবে পাল তোলা বড় বড় নৌকা যাতায়াত করত। সমুদ্রপথে যাতায়াতের জন্য মানুষ আকাশের তারা দেখে দিক নির্ণয় করত এবং এ সময় মানুষ সমুদ্র যাতায়াতের নিয়মকানুন চালু করেছিল।

৩. স্থায়ী বসতি নির্মাণ: ব্রোঞ্জ যুগে মানুষ অধিক জনসমষ্টি মিলে বড় বড় স্থায়ী মানবসমাজ গড়ে তোলে। গাছের গুঁড়ির ওপর ঘরের ছাউনি দিয়ে ঘর নির্মাণ করত। এ যুগের শেষদিকে মানুষ শবদাহ করার রীতি প্রচলন করে।

ব্রোঞ্জ যুগ

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে ব্রোঞ্জ যুগের প্রভাব

৪. লিখন পদ্ধতির উন্নতি: নব্যপ্রস্তর যুগে যে লিখন পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছিল তা ব্রোঞ্জ যুগে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল।

৫. চাকা তৈরি: চাকা আবিষ্কৃত হওয়ায় এ যুগের মানুষ চাকাওয়ালা গাড়ি যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করত। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ায় যাত্রীবাহী, পণ্যবাহী, যুদ্ধরত প্রভৃতি নানা ধরনের চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন শুরু হয়।

৬. মুদ্রার প্রচলন: ব্রোঞ্জ যুগে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। যার ফলে বিভিন্ন স্থানে বাজার গড়ে ওঠে। বাজারের আবির্ভাব পণ্য বিক্রেতাকে উৎপাদনে প্রেরণা যোগায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ০৭ তাম্র যুগ

টপিক ০৭: তাম্র যুগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

তাম্র যুগ

নব্য প্রস্তর যুগের শেষদিকে তামা আবিষ্কৃত হয়। তামা আবিষ্কারের পর মানুষ এটি দিয়ে বিভিন্ন রকম হাতিয়ার তৈরি করেছে। তামা পাথরের মতো ভঙ্গুর নয় এবং তুলনামূলকভাবে অনেক টেকসই। এজন্যই হাতিয়ার তৈরিতে পাথরের চেয়ে তামা বেশি ব্যবহৃত হতো বলে তাত্ত্বিকগণ মনে করেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, সর্বপ্রথম মিসরে তামার কাঁটা ও মাছ শিকারের কোচের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সুমেরু ও সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা তামার ব্যবহার জানত বলে তাত্ত্বিকগণ মনে করেন। তবে তখন পর্যন্ত মানুষ তামার ব্যবহার দ্বারা উল্লেখযোগ্য কোনো বিপ্লব ঘটাতে পারেনি। ব্যাপকভাবে তামার ব্যবহার শুরু হয় তা আবিষ্কারের অনেক পরে খ্রিষ্টপূর্ব চার হাজার অব্দে।

তাম্র যুগ

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে তাম্র যুগের প্রভাব

তাম্র যুগকে বলা হয় নব্য প্রস্তর যুগের সমাপ্তি এবং নগর সভ্যতার পূর্বপ্রস্তুতি পর্ব। তামা গলাবার জন্য উচ্চতাপের প্রয়োজন। সেই উচ্চমাত্রার তাপ সৃষ্টির জন্য আবিষ্কৃত হয়েছিল হাড়সহ চুল্লি, ধাতুর পাত্র, চিমচেট ও ছাঁচ। যদিও নব্য প্রস্তর যুগেই পাথরের তৈরি কয়েকটি ছাঁচের নিদর্শন পাওয়া গেছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০-৩০০০ হাজার অব্দে মেসোপটেমিয়া ও মিসরে তামার তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়। তাছাড়া ইরান, ইরাক, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, আনাতোলিয়া, হাঙ্গেরি ইত্যাদি দেশে এবং ভারতের হায়দারাবাদ, নাগপুর, মাদুরা ও মহীশূরে তামার তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। স্টুয়ার্ট পিগটের মতে, রাজপুতনা, ছোটনাগপুর ও সিংভূম জেলা হতে আগত তামা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির তৈরির কাজেও ব্যবহৃত হতো। প্রথম অবস্থায় ইউরোপে ব্যবহৃত তামার অধিকাংশই সাইপ্রাস থেকে আনা হতো। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে তাম্রনির্মিত বিভিন্ন জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এর ফলে মানুষের বস্তুগত সাংস্কৃতিক জীবনে সমৃদ্ধি আসে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ০৮ লৌহ যুগ

টপিক ০৮: লৌহ যুগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

লৌহ যুগ

লৌহ যুগ মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সর্বোচ্চ স্তর। মিসর ছাড়া আফ্রিকার সব অঞ্চলের মানুষ সরাসরি প্রস্তর যুগ হতে লৌহ যুগে প্রবেশ করে। লৌহের ব্যবহার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে শুরু হয়। যেমন মধ্যপ্রাচ্যে লৌহের ব্যবহার শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে। তবে লোহা শিল্পের সূচনা ঘটায় এশিয়া মাইনরে হিট্রাইটরা। এজন্যই হিট্রাইটকে বলা হয় লৌহ সংস্কৃতির আদি উৎপত্তিস্থল। পরবর্তীতে আসিরীয়রা লৌহের উৎপাদন শুরু করে। ধীরে ধীরে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা, নিকট প্রাচ্য ও ইউরোপে লৌহের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ইউরোপের দানিয়ুব, ক্রিট দ্বীপ ও গ্রিসে খ্রিষ্টপূর্ব এগারো শতকে লৌহ যুগের সূচনা ঘটে। ঈজিয়ান দ্বীপে লৌহ যুগের সূচনা ঘটে আরও কিছুকাল পরে। মার্টিন হুইলের মতে, ভারতে লোহার ব্যবহার শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে। চীনেও প্রায় একই সময়ে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। ভারতবর্ষ থেকে লোহার ব্যবহার ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফিনিসীয়, গ্রিক, রোমান ও চীন সভ্যতা হচ্ছে লৌহ যুগের উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সভ্যতা।

লৌহ যুগ

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে লৌহ যুগের প্রভাব

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে লৌহ যুগের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিই হচ্ছে লৌহ যুগ। এজন্য অনেকে আধুনিক সভ্যতাকে লৌহ যুগের সভ্যতা বলতেও দ্বিধা করে না। অন্য ধাতুসমূহের তুলনায় লোহা মজবুত ও টেকসই, দামেও সস্তা। এজন্য সবাই ব্রোঞ্জ বা অন্যান্য কঠিন ধাতুর তুলনায় লোহার ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মানবসভ্যতার অভাবনীয় উন্নতিতে লোহার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

লৌহ যুগে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে এক অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম ব্যবহারের কারণে অল্প পরিশ্রমে অধিক ফলন সম্ভব হয়েছে। কৃষি ও পশুপালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীর স্থান ধীরে ধীরে পুরুষেরা দখল করতে থাকে। এর ফলে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ধীরে ধীরে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে রূপ নেয়।

লৌহ যুগ

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে লৌহ যুগের প্রভাব

যানবাহন তৈরিতে লোহার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আধুনিক যানবাহন তৈরি এবং মানুষের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সারাবিশ্বের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক লেনদেন এবং ভাবের আদান-প্রদান সহজ হয়েছে। ঘরবাড়ি নির্মাণ, বিভিন্ন আসবাবপত্র ও গৃহসামগ্রী এবং বিভিন্ন প্রযুক্তির নির্মাণে লোহার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। শিল্পকলা ও স্থাপত্য শিল্পেও লোহার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আজকের শিল্পায়ন ও নগরায়ণ লৌহ সভ্যতারই এক অকৃত্রিম অবদান।

লৌহ যুগে মানুষের কাল্পনিক চিন্তাচেতনা পরিবর্তন হয়ে যুক্তিনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটে। লৌহ যুগে মানুষ সবকিছুকেই বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শেখে। এ যুগে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সামাজিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। ফলে শ্রেণিবৈষম্য ও সামাজিক ভেদাভেদ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কালসহ জেরার লৌহ যুগ মানেই আধুনিক সভ্যতার যুগ এবং এ যুগেই আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। আধুনিক সমাজ হলো সে সমাজ যেখানে মানুষ শিল্পকারখানা স্থাপন ও কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে।

লৌহ যুগ

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে লৌহ যুগের প্রভাব

প্রথমত, আধুনিক সমাজে মানুষের জাতীয় আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো স্বনির্ভর হওয়া।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক সমাজের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো রাজনীতিতে আপামর জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। অর্থাৎ রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে দাবি-দাওয়া আদায় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যাতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারে সে সুযোগ থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের দ্রুত বিকাশ আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিল্পের সম্প্রসারণ, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতির মাধ্যমে জনগণের ভৌগোলিক সচলতা আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থত, নিরক্ষরতা দূরীকরণ আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিক সমাজে কারিগরি বিদ্যা প্রসারের ফলে মানুষের শারীরিক শ্রম হ্রাস পায় এবং অবসর সময়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে আধুনিক সমাজে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস লোপ পায় এবং মানুষের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদী চিন্তার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

পঞ্চমত, আধুনিক সমাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রচার মাধ্যমগুলোর আধুনিকতা। জনসাধারণের নিকট নানা প্রকার তথ্য-সংবাদ এবং নানা বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান সরবরাহের জন্য সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন তথা ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর প্রভূত উন্নতি সাধন।

লৌহ যুগ

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে লৌহ যুগের প্রভাব

ষষ্ঠত, আধুনিক সমাজের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এ সমাজের মানুষের মধ্যে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশ কম। কারিগরি বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ও শিক্ষার সম্প্রসারণ এর প্রধান কারণ।

সুতরাং আধুনিক সমাজ বলতে সে সমাজকে বোঝায় যেখানে মানুষ মনমানসিকতার দিক দিয়ে আধুনিক এবং তারা অতীতের ধ্যানধারণার প্রতি অন্ধ আনুগত্য না দেখিয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে যুক্তিবাদী কার্যক্রম গ্রহণ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ০৯ সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

টপিক ৯: সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

This Topic is important for

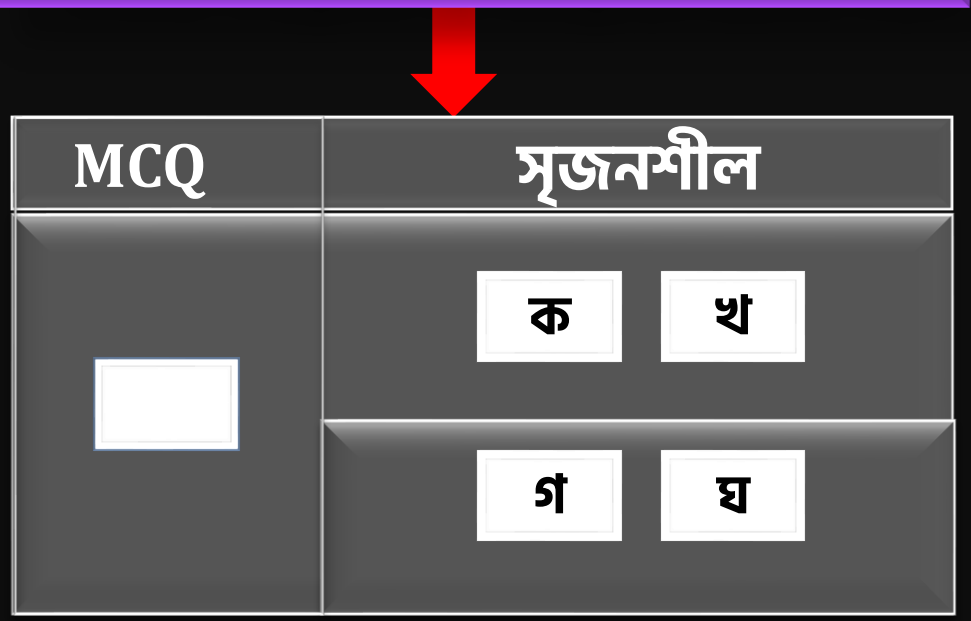

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি আমাদের এ বাংলাদেশ। এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসও বেশ প্রাচীন। কিন্তু কালের বিবর্তনে এদেশের প্রাচীন জনপদ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শনসমূহের অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রত্নস্থানসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর, বগুড়ার মহাস্থানগড়, রাজশাহীর পাহাড়পুর এবং কুমিল্লার ময়নামতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এ স্থানগুলোতে বহুবিধ প্রত্নসম্পদ ও স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব প্রত্নসম্পদের মধ্যে ইমারতের ধ্বংসাবশেষ, বাসভবন, মন্দির, স্তূপ, বৌদ্ধবিহার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ওই স্থানগুলো থেকে তখনকার যুগের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য, মুদ্রা, তাম্র ও শিলালিপিসহ আরও বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ সমস্ত প্রত্নসম্পদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা তখনকার সময়ের মানুষের জীবনপ্রণালি, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার একটি ধারণা পাই। বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে এসব প্রত্নস্থানের অবদান অনস্বীকার্য।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

অবস্থান ও নামকরণ: বাংলাদেশের আদি ঐতিহাসিক কালপর্বের প্রত্নস্থানগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম প্রত্নক্ষেত্র হচ্ছে উয়ারী-বটেশ্বর। এর অবস্থান হচ্ছে নরসিংদীর বেলাব উপজেলার অন্তর্গত উয়ারী-বটেশ্বর নামক পাশাপাশি দুটি গ্রামে। রাজধানী ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও আড়িয়াল খাঁ নদীর মিলনস্থলের তিন কিলোমিটার পশ্চিমে কয়রা নামক (বর্তমান কয়রা খাল) নদী খাতের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত উয়ারী-বটেশ্বর নামক এ প্রত্নক্ষেত্র।

উয়ারী ও বটেশ্বর পাশাপাশি দুটি গ্রাম। গ্রাম দুটির অবস্থান হচ্ছে প্লাইস্টোসিন যুগে গঠিত মধুপুর গড়ের পূর্ব সীমান্তে। কিন্তু এ দুটি গ্রামকে একসাথে উয়ারী-বটেশ্বর নামে ডাকা হয়। সংস্কৃত উপকারিকা শব্দ হতে উয়ারী নামটি উদ্ভূত হয়েছে। উপকারিকা অর্থ রাজবাড়ী বা রাজবাসযোগ্য পটমণ্ডপাদি। হিন্দিতে উয়ারী অর্থ পরিখাবেষ্টিত স্থান। বটেশ্বর গ্রামটির নামকরণ হয়েছে খুব সম্ভব বোধি বা বটবৃক্ষকেন্দ্রিক পূজাস্থল থেকে এবং এ নামকরণে বৌদ্ধ প্রভাব রয়েছে। এখানকার মাটির রং গৈরিক, যা প্রাচীনতম পলি নামে অভিহিত। এ অঞ্চলের ভূমিরূপ দেখে ধারণা করা হয়, এ প্রত্নস্থলের কাছ দিয়েই প্রবাহিত হতো প্রাচীন যুগের পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ। আড়িয়াল খাঁ এবং কয়রার মিলিত স্থান থেকে এ প্রত্নক্ষেত্রটি খুব বেশি দূরে নয়। অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় এ প্রত্নস্থানটি বন্যার কবল থেকে মুক্ত। এজন্য তখনকার সময়ে মানুষেরা এ এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। ব্রহ্মপুত্র নদের নৈকট্য এবং সহজে মেঘনার মতো বিশাল নদীতে প্রবেশের সুযোগ উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নস্থানটিকে বহুমাত্রিকতা দান করে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলি: উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে প্রস্তর যুগের অশ্মীভূত কাঠের বাটালি, পাথরের বাটালি (ডোলারাইট ও স্লেটপাথরে তৈরি), স্কন্ধযুক্ত বাটালি, লোহার ফলক, বর্শা, পেরেক, ছুরি, দা, বাটালি, পাথরের ছুরি, ক্ষুদ্রাকৃতি খেলনা হাত কুড়াল, বাঁট লাগানোর ছিদ্রহীন ত্রিকোণাকার লৌহ কুঠার, হাত-কুড়াল, লোহার ভারী হাতুড়ি বা পাটাতন, ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা, কাচের গুটিকা ও পুঁতি, মৃগুটিকা, স্বল্পমূল্য পাথরের গুটিকা, পোড়ামাটির ক্ষেপণীয় গোলক, কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, রোলেটেড মৃৎপাত্র, কৌশিক মৃৎপাত্র, বহুছিদ্রযুক্ত ক্ষুদ্রকায় মৃৎপাত্র, জন্তুর মুখের আদলে তৈরি মৃৎপাত্র, পাথরের নবযুক্ত বাটি, ব্রোঞ্জনির্মিত নবযুক্ত শিবকোষ, ব্রোঞ্জবলয়, টালি আকৃতির ইট, ক্ষয়িত হস্তীদন্ত, পাথরের তৈরি খুরাযুক্ত শিলনোড়া, পাথরের আয়তাকার বেদি, মৎস্যজালে ব্যবহৃত মৃৎগোলক, রিংস্টোন, নকশাঙ্কিত রক্ষাকবচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

নিদর্শনাবলির বিবরণ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব উয়ারী-বটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ধারণা পোষণ করেন, সম্ভবত প্রাচীন প্রস্তর যুগেই এখানে মানব বসতি শুরু হয়েছিল। ১৯৮৩ সালে উয়ারী গ্রামের উত্তর প্রান্তে কয়রা নামক শুষ্ক নদী খাতের তীরবর্তী উঁচু ভূমি সমতল করার সময় একটি হাত কুঠার খুঁজে পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এটিকে প্রস্তর যুগের বলেই মনে করেন। এছাড়া উয়ারীতে পঞ্চভুজাকৃতি একটি প্রস্তর খণ্ডক আবিষ্কৃত হয়েছিল, যার প্রান্ত ভাগ আনাড়িভাবে হাতিয়ারের আকৃতির। এটিকেও প্রস্তর যুগের নিদর্শন হিসেবেই মনে করা হয়। উয়ারী-বটেশ্বর ও এর পাশাপাশি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে নব্য প্রস্তর যুগের নয়টি বাটালি।

উয়ারী-বটেশ্বর ও সন্নিহিত প্রত্নক্ষেত্র থেকে পাওয়া গেছে লৌহনির্মিত প্রায় দুই হাজার কুড়াল, দা, ছুরি, বর্শাফলক, বাটালি, খুন্তি, পেরেক ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এগুলো নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ের নিদর্শন। ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোথাও এ পর্যন্ত অনুরূপ আকৃতির লৌহ নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ত্রিকোণাকার প্রতিটি কুড়াল লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি এবং আড়াই থেকে তিন ইঞ্চি পুরু। দেড় থেকে তিন কিলোগ্রাম ওজনের এ কুড়ালগুলোর মাথা চৌফলা আকৃতির, যা ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ আকৃতির হয়েছে। স্থানীয় কৃষকেরা কৃষিকাজ বা মাটি খননের সময় এগুলো খুঁজে পেয়েছেন।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

বটেশ্বরে আবিষ্কৃত হয়েছে স্বল্প মূল্যবান পাথরের গুটিকা, কাচের গুটিকা, ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, উচ্চমাত্রায় টিন মিশ্রিত ব্রোঞ্জনির্মিত নবযুক্ত পাত্র, উত্তর ভারতীয় মসৃণ কালো মৃৎপাত্র প্রভৃতি নিদর্শনসমূহ। এজন্য এগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত ও ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ বিবিধ অলঙ্কারে, সাজসজ্জায়, প্রসাধনে নিজেকে অপরূপ ও আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে বিভিন্ন চেষ্টায় রত ছিল। উয়ারী-বটেশ্বর, রাইঙ্গারটেক, সোনারুতলা ও কান্দুয়া গ্রামে পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে পাথরের তৈরি গুটিকা এবং এগুলোর প্রাপ্তিস্থল হিসেবে স্থানটির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় লোকেরা এগুলোকে বলে 'সোলেমানী'। গুটিকাগুলো তৈরিতে ব্যবহৃত পাথরের মধ্যে অ্যাসেইট, কার্নেলিয়ান, অনিক্স, লাল ও সবুজ জেসপার, কোয়ার্টজ, স্মোকি কোয়ার্টজ, অ্যাগেইট চেলসেডোনি, মিল্কি কোয়ার্টজ, মার্বেল, গার্নেট, ক্রিস্টাল, গ্রানাইট, বেলে পাথর, অ্যামেথিস্ট, চার্ট, হোয়াইট পেস্ট, রেডস্টোন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মূল পাথর থেকে বিভিন্ন আকারে কেটে গুটিকাগুলো তৈরি করা হয়েছে বলে একটির সাথে আরেকটির হুবহু মিল পাওয়া যায় না।

উয়ারী-বটেশ্বর

গুটিকাগুলো তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে অত্যন্ত নিপুণতা, দক্ষতা ও রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কোনো গুটিকার কাটাই হীরকখণ্ডের মতো, কুলবীচিসম ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে ১২টি অথবা ২৪টি সমবাহু ত্রিভুজ কাটাই; কোনোটিতে চিরস্থায়ী সাদা ও হলদে রং দ্বারা রেখা ও নকশার অলঙ্করণ, পলিশ করা, সূক্ষ্ম ছিদ্রকরণ প্রভৃতি পর্যায় নির্মাতাদের সুকুমার শিল্পচাতুর্য ও উন্নত প্রযুক্তির পরিচয় বহন করে। গুটিকাগুলো দিয়ে শক্ত সরু সুতায় মালা গেঁথে গলা, হাত, কোমর, বাজু, নাক, কানসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যবহার করা হতো। শরীরের শোভাবর্ধন ছাড়াও এগুলোর বিশেষ জাদুকরী শক্তি ছিল বলে ধারণা করা হতো। মানুষ এগুলোকে অপদেবতার কোপদৃষ্টি প্রতিরোধক ও মঙ্গলকর ভেবে অঙ্গে ধারণ করত।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

উয়ারী গ্রামের পশ্চিম পার্শ্ব সংলগ্ন সোনারুতলা গ্রাম থেকে চার্ট পাথরে তৈরি, মধ্যভাগে অদ্ভুত শিল্পসম্মত খোদাই কাজ করা একটি বিষ্ণুপট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। চ্যাপ্টা নাক ও পুরু ঠোঁটবিশিষ্ট মূর্তিটির মাথায় চোঙা আকৃতির মুকুট রয়েছে এবং কানে রয়েছে বড় ধরনের ঝুলন্ত দুল। খোদিত এ পট্টটির দৈর্ঘ্যের উপরিভাগের দুই প্রান্তে রয়েছে দুটি ছিদ্র। তাত্ত্বিকদের মতে, অনুপম শিল্পমণ্ডিত এবং অত্যন্ত দুর্লভ এ একক শিল্পকর্মটি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের।

উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে তুরাইন প্রতীক সংবলিত ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে দুর্ভাগ্য ও কুদৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হতো বিভিন্ন রক্ষাকবচ। আদি ঐতিহাসিক কালপর্বের তক্ষশিলা, কৌশাম্বী, কোন্ডাপুর, প্রকাশ প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্র থেকে যেসব আকৃতির রক্ষাকবচ পাওয়া গিয়েছে তার সাথে উয়ারীতে প্রাপ্ত রক্ষাকবচটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্পূর্ণভাবেই পৃথক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এটিকেই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত এ আকৃতির একমাত্র নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

উয়ারীতে এ রক্ষাকবচটির মতো নকশাঙ্কিত একটি প্রস্তর খণ্ডও পাওয়া গেছে। এটি চার্ট পাথরে খোদাইকৃত ও দুটি ছিদ্রযুক্ত। এর আয়তন নিদর্শনটির আয়তন ৬.৩৫ সে.মি., ৫.০৮ সে. মি.। এটির প্রস্থ বরাবর রয়েছে দুটি প্রশস্ত সমান্তরাল সরলরেখা এবং রেখাদ্বয়ের উভয় পাশে খোদিত রয়েছে অত্যন্ত নিপুণভাবে সমপরিমাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তের সারি। খোদিত বৃত্তের প্রতিটির মাঝখানেই রয়েছে একটি করে বিন্দু। এভাবে এসব বৃত্তের বিন্যাস দ্বারা সমান্তরাল সারির সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে চারটি সারি রয়েছে। এ চারটির মধ্যে তিনটিতে রয়েছে ১২টি করে এবং অপরটিতে রয়েছে ১৫টি করে খোদিত বৃত্ত। একটি ক্ষুদ্র পরিসরে চারটি সমান্তরাল সারিতে ৫১টি সমমাপের বৃত্ত এক অনিন্দ্যসুন্দর দৃষ্টিনন্দনতার সৃষ্টি করেছে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর জীবন-জীবিকার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে লাঙল। তাই উয়ারীতে প্রাপ্ত সবুজ কাচের গুটিকায় লাঙল প্রতীক উৎকীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোনো প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত গুটিকায় এরূপ প্রতীক অঙ্কনের কথা জানা যায় না। এজন্য ধারণা করা হয়, এটি খুব সম্ভবত স্থানীয়ভাবে নির্মিত এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলনযুক্ত। তাত্ত্বিকদের মতে, লাঙল প্রতীকটি শিব বা বলরামের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রচুর ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৩৩ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত উয়ারী গ্রামের ৮টি স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে মৃৎপাত্রে সঞ্চিত মুদ্রা। সত্তরের দশকে উয়ারী গ্রামের জনৈক ব্যক্তি মাটি খননকালে খুঁজে পান একটি কালো মৃৎপাত্রে রক্ষিত প্রায় চার হাজার মুদ্রা। উয়ারী গ্রাম ছাড়াও নরসিংদী জেলার আরও বিভিন্ন স্থান থেকে ছাপাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। উয়ারী থেকে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলো গোলাকার, উপগোলাকার, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজাকার ও আয়তাকার বার আকৃতির।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

ভট্টশালীর মতে, উয়ারী থেকে ৭ কি.মি. দক্ষিণে মরজাল গ্রামে ছাপাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্তিতে আড়িয়াল খাঁ নদের তীরে মৌর্যপূর্ব বা মৌর্য যুগের জনবসতি ছিল বলে প্রমাণ করে। এখান থেকে ৮ কি.মি. উত্তরে আড়িয়াল খাঁ তীরস্থ ব্রাহ্মণেরগাঁও (উপজেলা মনোহরদি) অঞ্চলেও পাওয়া গেছে ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ধারণা করেন, উয়ারী-বটেশ্বর, বেলাব, পাটুলি, মরজাল প্রভৃতি গ্রাম খুব সম্ভবত মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমানাকে নির্দেশ করত। উয়ারী-বটেশ্বরে মৌর্যদের অসংখ্য প্রত্নদ্রব্য দেখে ধারণা করা হয়, এগুলো খুব সম্ভবত পুণ্ড্রবর্ধনের সমসাময়িক। উয়ারীতে প্রাপ্ত একটি মুদ্রায় মাংস খণ্ড মুখে কুকুরের একটি প্রতীকও রয়েছে। প্রতীকটি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের। উয়ারীতে এত অধিক সংখ্যক মুদ্রা প্রাপ্তির ফলে পণ্ডিতগণ মনে করেন, এটি এক সময় বাণিজ্যনগরী বা প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। এখানকার বহির্বাণিজ্যের নিদর্শন পাথর ও কাচের গুটিকা, সম্প্রতি আবিষ্কৃত চুনসুরকির পাকা রাস্তা এবং ভূগর্ভে অন্তত ১৫/২০টি স্থানে ইটের স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাত্ত্বিকগণ ধারণা করেন, উয়ারী-বটেশ্বর শিল্পবাণিজ্য এবং প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে বাংলার আদি ঐতিহাসিক কালপর্বে এক সমৃদ্ধ নগরীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

উয়ারী থেকে লালচে বেলে পাথরের তৈরি ৫.০৮ সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট একটি রিংস্টোনের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতেও বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন আকৃতির রিংস্টোন আবিষ্কৃত হয়েছে।

সম্প্রতি সোনারুতলা গ্রাম থেকে লালচে বেলে পাথরে তৈরি একটি নবযুক্ত বাটির ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া আবিষ্কৃত হয়েছে অনুপম শিল্পমণ্ডিত একটি বিষ্ণুপট্ট এবং সমাধি সংস্কৃতির হাইটিন ব্রোঞ্জের একটি পাত্র। এখান থেকে প্রাপ্ত ছাপাঙ্কিত মুদ্রা, পাথর ও কাচের গুটিকা, বিষ্ণুপট্ট, হাইটিন ব্রোঞ্জের পাত্র ইত্যাদি সামগ্রী সমসাময়িককালে ব্যবহৃত হতো বলে পণ্ডিতগণ ধারণা করেন।

উয়ারী গ্রামের পূর্বেরটেকের দক্ষিণ প্রান্তে একটি উপদ্বীপসদৃশ উঁচুভূমিতে কিছুকাল আগে একটি ব্রোঞ্জনির্মিত শিবনৈবেদ্য পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মৎস্যচাষের জন্য ক্ষুদে পুকুর খননের সময় সমতল থেকে এক মিটার গভীরে একত্রে দুই হাতলবিশিষ্ট একটি বড় ব্রোঞ্জ পাত্রে অনেকগুলো ব্রোঞ্জবলয়, জলতরঙ্গ, মল প্রভৃতির সঙ্গে অলঙ্কৃত ও নব্যুক্ত একটি শিবনৈবেদ্য পাত্র জমানো অবস্থায় পাওয়া যায়। পাত্রটির অলঙ্করণে অত্যন্ত উন্নত শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

সম্প্রতি এখানে বেলে পাথরে তৈরি একটি বেদির সম্মুখভাগের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্রিপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ বা ত্রিপাপড়িবিশিষ্ট ফুল ও ত্রিরত্ন প্রতীক উৎকীর্ণ এ নিদর্শনটিও পূর্বোক্ত শিল/বেদির সমপর্যায়ভুক্ত এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া এখানে ক্ষুদ্রকায় নৌকা আকৃতির ধূসর পোড়ামাটির কৌশিক পাত্রও রয়েছে। কৌশিক পাত্রটি দেবদেবীর গায়ে বা মন্দিরে পুণ্যজল ছিটানোর কাজে ব্যবহৃত হতো।

এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা শৈবধর্মে বিশ্বাস করত বলে ধারণা করা হয়। সম্প্রতি প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ নৈবেদ্য পাত্রে অঙ্কিত বৃষবাহন শিব, মূষিকবাহন গণেশ, বলরাম ইত্যাদি শৈব বিশ্বাসের প্রতীক। এক্ষেত্রে ছাপাঙ্কিত মুদ্রার অঙ্কিত ত্রিশূল প্রতীকও শৈবধর্মের পরিচয় বহন করে। এছাড়া উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত ত্রিরত্ন গুটিকা, অর্ধচন্দ্র গুটিকা, ছাপাঙ্কিত মুদ্রায় অঙ্কিত বৃষ প্রভৃতি এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের শৈবধর্ম বিশ্বাসের পরিচায়ক। ব্রোঞ্জপাত্রটি নব্যুক্ত হওয়ায় এতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ প্রতিফলিত হয়েছে। একই স্থান থেকে ত্রিরত্ন ও স্বস্তিকাখোদিত প্রস্তর বেদিও পাওয়া গেছে। এতে ধারণা করা হয়, আদি ঐতিহাসিক কালপর্বে উয়ারী-বটেশ্বরে ধর্মের পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

বিশেষজ্ঞদের মতে, উয়ারী-বটেশ্বরে নগরেরও পত্তন হয়েছিল। এখানকার ১৫/২০টি স্থানে কৃষকদের মাটি খননকালে বৃহৎ টালি নির্মিত স্থাপনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে একটি স্থানের ইট পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এগুলো তৈরিতে ধানের তুষ ব্যবহৃত হয়েছে।

সম্প্রতি সোনারুতলা গ্রাম থেকে একটি পাথরের ও একটি পোড়ামাটির নিবেদন স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর নির্মাণ পদ্ধতি, অলঙ্করণ এবং পোড়ানোতে কারিগরি জ্ঞানের অদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে ধারণা হয়, এগুলো প্রস্তর যুগের। কাদামাটিতে ধান বা ধানের তুষ মিশিয়ে ইট ও মৃৎপাত্র নির্মাণের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন।

উয়ারী গ্রামে ২০০০ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত হয় উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের স্তর থেকে ধসেপড়া একটি দেয়ালের অবশিষ্টাংশ। উয়ারী গ্রামে ৬৩৩ মিটার দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট বর্গাকৃতি গড় ও পরিখা আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্ব পাশের পরিখাটি ছাড়া গড় ও পরিখার চিহ্ন প্রায় বিলুপ্তির পথে। সোনারুতলা গ্রাম থেকে শুরু করে বটেশ্বর, হানিয়াবাইদ, রাজারবাগ ও আমলাব গ্রামের ওপর দিয়ে আড়িয়াল খাঁ নদের প্রান্তসীমা পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আরেকটি বহির্দেশীয় গড় ও পরিখা বিস্তৃত। স্থানীয় লোকজন এটিকে বলে 'অসম রাজার গড়'।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

উয়ারী-বটেশ্বর

২০০৪ সালে উয়ারী গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮ মিটার দীর্ঘ, ৬ মিটার প্রশস্ত ও ৩০ সে. মি. পুরু একটি প্রাচীন পাকা রাস্তা। রাস্তাটির নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে ইটের টুকরা, চুম, উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ মসৃণ মৃৎপাত্রের টুকরা। কোনো কোনো তাত্ত্বিক এটিকে আড়াই হাজার বছরের পুরনো বলে দাবি করেন। এ সম্পর্কে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তী এত দীর্ঘ ও চওড়া রাস্তা এর আগে পুরো গাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ণ সভ্যতায় কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি বলে মনে করেন। গাঙ্গেয় উপত্যকার দ্বিতীয় নগরায়ণ বলতে বোঝায় সিন্ধু সভ্যতার পরের নগরায়ণের সময়কে। ফলে আবিষ্কৃত এ রাস্তাটি শুধু বাংলাদেশেই নয়, সিন্ধু সভ্যতার পর ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরনো রাস্তা এটি।

উপরিউক্ত আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি, এখান থেকে আবিষ্কৃত আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন নগরের মানব বসতির ৬০০ মিটার বাই ৬০০ মিটার বিস্তৃত দুর্গ এলাকা, ইটের স্থাপত্য, প্রশস্ত রাস্তা, পার্শ্বরাস্তা, দুর্গ প্রাচীর, পরিখা, অসম রাজার গড়, পোড়ামাটির নিক্ষেপাস্ত্র, তাবিজ, ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, লৌহনির্মিত হস্তকুঠার, বল্লম, উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, মুদ্রাভাণ্ডার, নবযুক্ত মৃৎপাত্র, কাচের পুঁতি, বাটখারা, গর্তনিবাস, ধাতব চুড়ি বা তাম্রবালা, পোড়ামাটির চাকতি, বৌদ্ধ পদ্মমন্দির এবং ইটের স্থাপত্য প্রভৃতি উয়ারী-বটেশ্বরের প্রাচীন ইতিহাসের ধারণাকে স্পষ্ট করে। ধারণা করা হয়, এগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ১০০ বছর আগের, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

মহাস্থানগড়

অবস্থান: বগুড়া শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত কোলাহল মুখরিত এক জনপদের নাম হচ্ছে মহাস্থানগড়। এ জায়গাতেই হাজার হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল সভ্যতা। এখানেই গড়ে উঠেছিল শিক্ষাকেন্দ্র, নৌবন্দর, বড় বড় দালানকোঠা, প্রশস্ত রাস্তাঘাট, দুর্গ, সেনানিবাস ইত্যাদি। বাণিজ্যিকভাবেও এ স্থানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে বিদ্যানুরাগী, সওদাগর ও রাজদূতদের আগমন ঘটত এ শহরে। দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাচীনকালের এ রাজধানী শহরটির খ্যাতি। এ স্থানের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এদেশের আদি বাসিন্দাদের অমর কীর্তিসমূহ। এখানেই অবস্থিত ছিল বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর পুণ্ড্র। এজন্য মহাস্থানগড়কে পুণ্ড্রনগর নামেও অভিহিত করা হয়। মহাস্থানগড়ের দৈর্ঘ্য ৫০০০ ফুট, প্রস্থ ৪৫০০ ফুট এবং চারপাশের সমতল ভূমি থেকে এর উচ্চতা ১৫ ফুট। এ প্রাচীন নগরীর বাইরে পাঁচ মাইল পর্যন্ত শহরতলি ছিল বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের আর কোথাও এরূপ বিস্তীর্ণ শহরতলিযুক্ত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এ নগরী এক সমৃদ্ধ জনপদরূপে গড়ে ওঠে। তারপর থেকে এ নগরী তার গৌরব হারাতে শুরু করে। বেশ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ স্থান ছিল মৌর্য, গুপ্ত, পালসহ আরও কয়েকটি হিন্দু সামন্ত রাজবংশের রাজধানী।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

মহাস্থানগড়

নামকরণ : মহাস্থানগড় নামের উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। মহাস্থান শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিখ্যাত বা মহান জায়গা। কেউ কেউ মনে করেন, এর প্রকৃত নাম হচ্ছে মহাস্নান বা বিখ্যাত স্নানের জায়গা। অর্থাৎ মহাস্নান থেকেই মহাস্থানগড়ের নামের উৎপত্তি হয়েছে। আবার স্থানীয় মুসলমানগণ মনে করেন, এ স্থানের আসল নাম হচ্ছে মস্তানগড়। মহাস্থানগড়ের সর্বশেষ ক্ষত্রীয় নরপতি পশুরামকে পরাজিত করে শাহ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ার এ দেশে সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন। মহাস্থানগড়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এ আউলিয়ার মাজার অবস্থিত। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মহাস্থানগড়ের নামের উৎপত্তি বাংলাদেশের ফকির সম্প্রদায়ের দলপতি মজনু শাহ মস্তানা বোরহানার নামের সঙ্গে জড়িত।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

মহাস্থানগড়

প্রাপ্ত প্রধান প্রধান নিদর্শন এবং এগুলোর গুরুত্ব: মহাস্থানগড়েই অবস্থিত ছিল বাংলাদেশের প্রাচীন নগর পুণ্ড্র। এটি ছিল একটি প্রাচীন দুর্গনগরী। এর চারপাশে প্রায় ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এর শহরতলি। প্রাচীন পুণ্ড্রনগর এবং শহরতলির অধিকাংশ এখন পর্যন্ত মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। দুর্গনগরীর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত তখনকার মুসলিম সাধক শাহ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ারের মাজার। যে ঢিবির উপর মাজারটি অবস্থিত সেখানকার মাটির নিচে প্রাচীন সভ্যতার আরও অনেক নিদর্শন লুকিয়ে আছে বলে অনুমান করা হয়। খননকার্যের মাধ্যমে পুণ্ড্রনগরের যতটুকু রহস্য উদঘাটন সম্ভব হয়েছে তাতেই বোঝা যায়, তখনকার মানুষ পুরকৌশল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্যবিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিল। প্রাচীরসহ পাকা ইমারত, সুদৃশ্য ইটের সিঁড়ি, বারান্দাযুক্ত বহুতল অট্টালিকা, ইট পাথর বাঁধানো রাস্তা, কুয়ো, পানি নিষ্কাশনের নালা ইতাদির ধ্বংসাবশেষ এখানকার সভ্যতার উৎকর্ষকে ফুটিয়ে তোলে। এখানকার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ও পাল রাজবংশের কীর্তিসমূহ। এখানে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শুঙ্গ যুগীয় পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে। দুই হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও এ ফলকে চিত্রিত ঘোড়ায় টানা রথের দৃশ্যের সৌন্দর্য আজও অম্লান। এখানে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ের লোহা, তামা, সোনা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতু এবং পাথর ও পোড়ামাটির তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

মহাস্থানগড়

পুণ্ড্রনগরীকে ঘিরে রাখা নগর প্রাচীরেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এ প্রাচীরগুলো কোথাও আঁকাবাঁকা আবার কোথাও সোজা। কোথাও ঢালু আবার কোথাও খাড়া। এ প্রাচীরের কোথাও কোথাও কুলুঙ্গি আবার কোথাও আক্রমণের সুবিধার্থে ছিদ্র পথ রাখা হয়েছিল। এদিক থেকে চীনের মহাপ্রাচীরের সাথে এ প্রাচীরের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। প্রহরীরা যাতে হেঁটে হেঁটে পাহারা দিতে পারে সেজন্য প্রাচীরের ওপর প্রশস্ত রাস্তাও বানানো হয়েছিল। প্রহরী কক্ষবিশিষ্ট পর্যবেক্ষণকেন্দ্রও বানানো হয়েছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। অতি সম্প্রতি নগরের ফটকের গায়ে পূর্বমুখী ও উত্তরমুখী দুটো বিরাট ফটকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

নগরীর দক্ষিণ-পূর্বকোণে পাশের ভূমি থেকে প্রায় ২৫ ফুট উপরে অবস্থিত সুলতান মাহী সাওয়ারের মাজার। এ মহাপুরুষের প্রকৃত নাম হচ্ছে মীর সৈয়দ সুলতান মাহমুদ। তিনি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ ও মানিকগঞ্জের হরিরামপুর হয়ে এখানে এসেছিলেন। এখানে এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। ১৭১৯ সালে ফররুখশিয়ারের আমলে এটি নির্মিত হয়েছিল বলে মসজিদের প্রবেশ পথের ফারসি শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে। মাজারের প্রবেশপথে পাথরের চৌকাঠে দুটি স্থানে তিন-চার শ বছরের পুরনো বাংলায় খোদাই করে লেখা রয়েছে 'শ্রীনর দাসস্য'।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

মহাস্থানগড়

মাজার থেকে প্রায় ৬০০ ফুট উত্তর-পশ্চিমে এক বিশাল গাছের নিচে দুটো ভাঙা অংশসহ বিরাট এক পাথর পড়ে থাকতে দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, এ পাথরটির রোগমুক্তির ক্ষমতা আছে। ফলে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে অনেকেই ফুলের নকশা আঁকা এ পাথরে দুধ ঢেলে রোগমুক্তি কামনা করেন। এ পাথরটি থেকেই জায়গাটির নামকরণ করা হয়েছে খোদার পাথরভিটা। এখানে একটি বৌদ্ধমন্দির রয়েছে। এ থেকে তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, এখানে একসময় বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতির বেশ প্রভাব ছিল।

খোদার পাথরভিটার প্রায় ৬০০ ফুট উত্তর-পূর্ব দিকে একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ রয়েছে এবং তার লাগোয়া পশ্চিমে রয়েছে একটি গভীর শুকনো পুকুর। এ পুকুরটি মানখালির কুণ্ডু নামে পরিচিত। এখানে জৈনমূর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর থেকে ধারণা করা হয়, জৈনধর্মের প্রচারক গোশালা মানখালি পুত্রের নামানুসারেই এটির নাম হয়েছে মানখালীভিটা। এখানে জৈনধর্মের প্রচলন ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে প্রায় ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের ঘোড়াঘাটের প্রতাপশালী মানখালীদের নামানুসারে এখানকার নামকরণ করা হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধারণা করা হয়, প্রায় ২৫০০ বছর আগেও এখানে সুসভ্য মানুষ বসবাস করত। তাছাড়া খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শুঙ্গযুগের চিত্রফলক, নীলাভ পাথরের বেদি, রেলিংয়ের স্তম্ভ, মন্দিরের চূড়ার অংশ, মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি খোদিত ফলক ইত্যাদির নিদর্শনও এখান থেকে পাওয়া গেছে। গুপ্ত আমলেরও পূর্বে এখানে মন্দির ছিল বলে ধারণা করা হয়।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

মহাস্থানগড়

মানখালীর কুণ্ডের প্রায় ৬০০ গজ উত্তরে অবস্থিত রয়েছে পরশু রামের বাড়ি। এখানে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল যুগে নির্মিত একটি মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পাথরের বিষ্ণুপট্ট ও পোড়ামাটির ফলকও এখানে পাওয়া গেছে। রাজা পরশুরাম এখানে বাস করতেন বলে ধারণা করা হয়।

পরশুরামের বাড়ি থেকে পূর্বদিকের নগর প্রাচীরের দিকে সামান্য এগোলেই দেখতে পাওয়া যায় ১২ ফুট আট ইঞ্চি আয়তনবিশিষ্ট একটি পাকা কুয়ো। এটি জীয়ৎ কুন্ড নামে পরিচিত। জীয়ৎ কুণ্ড থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত জায়গাটি হচ্ছে বৈরাগীর ভিটা। এটি আশপাশের ভূমি থেকে প্রায় দশ ফুট উঁচু। এখানে অন্তত তিনটি স্তরের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে সর্বোচ্চ স্তরে শেষ পাল যুগের মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। মধ্যস্তরে রয়েছে প্রথম পাল যুগ এবং সর্বনিম্ন স্তরে গুপ্তযুগের মন্দিরের অস্তিত্ব চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি প্রথম যুগের মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত। এর চারপাশে ইট বাঁধানো ঢালু মেঝেতে ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি × ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি আয়তনের ছোট ছোট কক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ মন্দিরের অঙ্গান ইটের তৈরি ৫টি চৌবাচ্চা পাওয়া গেছে, যা খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে নির্মিত বলে তাত্ত্বিকগণ মনে করেন।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

মহাস্থানগড়

বৈরাগীর ভিটার প্রায় ৬০০ ফুট দক্ষিণ-পূর্বদিকে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত দালানকোঠাসহ পাঁচটি পাত কুয়োর নিদর্শন রয়েছে। নগরীর পূর্বদিকের দুর্গ প্রাচীর ঘেঁষে এ জায়গাটি অবস্থিত। নির্মাণের ১৩০০ বছর পেরিয়ে গেলেও এখানকার দালানকোঠা এবং পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত পাত কুয়োগুলো এখনও অটুট অবস্থায় রয়েছে। এখানে পোড়ামাটির ফলকচিত্রে শোভিত একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে নির্মিত মৌর্য যুগের একটি মেঝে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে এখানে গুপ্ত, পাল এবং সুলতানি আমলের জনবসতির প্রমাণসহ প্রাচীন কীর্তির বিভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

নগরীর উত্তর দিকের দুর্গ প্রাচীরের পূর্বদিকের উঁচু ঢিবি খনন করে চারটি নির্মাণ যুগকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে গুপ্ত যুগ, পাল যুগ, সেন যুগ ও সুলতানি আমল। এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাত্ত্বিকগণ ধারণা করেন, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শুঙ্গ আমলের আগেও এখানে জনবসতি ছিল।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

মহাস্থানগড়

বৈরাগীর ভিটার বিপরীত দিকে দুর্গ প্রাচীরের প্রায় ২০০ গজ পূর্বে অবস্থিত শিলাদেবীর ঘাট। এখনও এখানে বিভিন্ন আকৃতির পাথর পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ স্থানটির নাম ছিল শিলাদ্বীপ। কালক্রমে তা পরিবর্তিত হয়ে শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

নগর প্রাচীরের বাইরে উত্তর দিকে করতোয়া নদীর তীর ঘেঁষে রাস্তার পাশেই অবস্থিত ইতিহাসখ্যাত গোবিন্দ ভিটা। এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের ভিত্তিতে তাত্ত্বিকগণ ধারণা করেন, খ্রিষ্টপূর্ব চার শতাব্দীতে এখানে সভ্য মানুষের বসতি স্থাপিত হয়েছিল। এ স্থানটির ঐতিহ্য ও প্রাচীনতা সম্পর্কে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ 'করতোয়া মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তাত্ত্বিকগণের মতে, যিশুখ্রিষ্টের জন্মেরও পাঁচ শতাধিক বছর আগে থেকেই এখানে মানবসভ্যতার পত্তন হয়েছিল। এখান থেকে প্রাপ্ত ছাঁচে ঢালা ও ছাপযুক্ত তাম্রমুদ্রা এবং এ. বি. পি. পাথর খণ্ড তারই সাক্ষ্য বহন করে। এখানে পোড়ামাটি, তামা, ব্রোঞ্জ ও পাথরের তৈরি অলঙ্কার, মূর্তি, খেলনা ইত্যাদিও আবিষ্কৃত হয়েছে। মুকুট পরিহিত নারীর মাথা এবং যুক্তমূলবিশিষ্ট তিনটি গমের শীষের চারদিকের কিনার ঘেঁষে উৎকীর্ণ ২২টি ব্রাহ্মী অক্ষরবিশিষ্ট একটি গোলাকার সিল প্রাপ্ত গুপ্তযুগের নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। এখান থেকে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আদিমাতা অঙ্কিত ছয়টি মৃন্ময় চিত্রফলক পাওয়া গেছে। এখান থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খ্রিষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের নীলাভ পাথরে উৎকীর্ণ একটি প্রসাধন থালা পেয়েছেন, যাতে এক জোড়া উপবিষ্ট হরিণ, একটি বাঘ, একটি হাতি এবং এদের মাঝখানে কলসি থেকে উদাত পুষ্পমালা উৎকীর্ণ রয়েছে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

মহাস্থানগড়

মহাস্থান থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে একটি বিখ্যাত ও প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, যা ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন কার্তিকের মন্দির। আর এ স্থানটি 'স্কন্দের ধাপ' নামে পরিচিত। এ মন্দিরটির সাথে প্রাচীনকালের কাশ্মীর রাজ বিনয়াদিত্য ও তখকার সেরা নর্তকী কমলার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।

মহাস্থান থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ইটের তৈরি একটি প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর অর্থাৎ গুপ্ত ও তার পরবর্তী যুগের পোড়া ও আধা পোড়ামাটির তৈরি নারীদেহ এবং মাথার মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ধারণা করেন, এখানে তখনকার সময়ে সর্পপূজারি মানুষের বসবাস ছিল।

মহাস্থান থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূমি থেকে প্রায় ৪৩ ফুট উঁচু একটি ঢিবির উপরে বিরাট মেধ নামে একটি মন্দির রয়েছে। স্থাপত্য শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে এ মন্দিরটি। এখানে বিভিন্ন আকৃতির মোট ১৭২টি ভরাট করা কুঠুরি পাওয়া গেছে। এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয়, এটি একসময় বৌদ্ধদের কেন্দ্রীয় উপাসনালয় ছিল। স্বর্ণ পাত্রটিতে একটি উপবিষ্ট ষাঁড়ের প্রতিকৃতি দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ধারণা করেন, এ মন্দিরটি কোনো এক সময় শিবমন্দির ছিল।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

পাহাড়পুর বিহার

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: বাংলাদেশের মানবসভ্যতার ইতিহাসের সেরা কীর্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম আরেকটি কীর্তি হচ্ছে সোমপুর বিহার বা পাহাড়পুর বিহার। প্রাচীনকালের মানুষের তৈরি এ কীর্তিটি বর্তমান নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত। এটি পৃথিবীর বিশাল আকৃতির বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে অন্যতম। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে এর চেয়ে বড় কোনো বৌদ্ধ বিহার নেই। এ বিহারের ভিক্ষুরা নালন্দা, বুদ্ধগয়া ইত্যাদি ধর্ম উপাসনালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রে ধনরত্ন ও নগদ অর্থ সাহায দিতেন। এতে এ বিহারটির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতো এ বিহারটি। একসময় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি নালন্দাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল বলে একে বাংলাদেশের নালন্দা বলে অভিহিত করা হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অতীশ দীপঙ্কর এবং পণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্রের নাম খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

পাহাড়পুর বিহার

অবস্থান ও নামকরণ: পুঞ্জনগর বা মহাস্থানগড় থেকে পাহাড়পুর বিহারের দূরত্ব প্রায় ত্রিশ মাইল। নওগাঁ জেলার বদলগাছিতে সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। বাংলাদেশ পূর্ব রেলওয়ের পার্বতীপুরগামী প্রধান শাখা লাইনের জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এ পাহাড়পুর। পাহাড়পুর অতি সাধারণ একটি গ্রাম হলেও সোমপুর বিহার এ গ্রামটিকে এক অসাধারণ মর্যাদাদান করেছে। দীর্ঘকাল মাটির নিচে থাকার পর ১৯৩৪ সালের দিকে সভ্যজগতের সামনে সোমপুর বিহারের রহস্য পুরাপুরি উন্মোচিত হয়। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ধর্মপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্রে এক বিশাল ও সুউচ্চ মন্দির স্থাপনের লক্ষ্যে পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন। পাহাড়পুর গ্রামের নামানুসারে একে পাহাড়পুর বিহার বলে অভিহিত করা হয়।

এ বিহারের বহির্কাঠামোটি প্রায় বর্গাকৃতির। এর আয়তন ৯২২ ফুট × ৯১৯ ফুট। দুর্গের মতো উঁচু প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত ছিল এ বিহারটি। এখানে তখনকার সময়ের ছাত্রাবাসের ১১৭টি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি কক্ষের আয়তন ১৪ ফুট × ১৩ ফুট। প্রতিটি কক্ষের সাথেই ছিল লাগোয়া ৮ থেকে ৯ ফুট চওড়া বড় টানা বারান্দা। অত্যন্ত যত্নের সাথে নির্মিত হয়েছিল এ বিহারটি। বিহারের অভ্যন্তরের প্রধান মন্দিরটির আয়তন হচ্ছে ৩৫৬ ফুট ৬ ইঞ্চি × ৩১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। মন্দিরের নকশা এবং দেয়ালে অলঙ্কৃত ইটের মাধ্যমে তখনকার সুসভ্য মানুষের রুচিশীলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। কোনো রকম সিমেন্ট ছাড়া ফলকগুলো দেয়ালের সাথে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে আটকে আছে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

পাহাড়পুর বিহার

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের বিবরণ ও গুরুত্ব: পাহাড়পুর বিহারে ৪৪৮-৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দের একটি তাম্রফলক পাওয়া যায়। এ তাম্রফলকে উৎকীর্ণ লিপিতে গুপ্তযুগের জৈন বিহারের উল্লেখ থাকায় তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, এখানে একটি জৈন বিহার ছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দিকে রাজা শশাঙ্কের শাসনামলে জৈনরা এ বিহারটি পরিত্যাগ করেন। তখন এটি ব্রাহ্মণ্য মতানুসারীদের উপাসনালয়ে পরিণত হয়। রাজা শশাঙ্ক নিজেও ব্রাহ্মণ্য মতানুসারী ছিলেন। এ. কে. দীক্ষিতের মতে,

এখানেই অবস্থিত ছিল বাংলার প্রাচীনতম কৃষ্ণ উপাসনা কেন্দ্রটি। এরপর খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এখানে ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। বৌদ্ধ আমলেই পাহাড়পুর মর্যাদার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়। এখানেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে। মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য টেরাকোটার পাশাপাশি বহুসংখ্যক বিচিত্র পাথরও ব্যবহৃত হয়েছিল। মন্দিরের প্রাচীরের নিচের দিকে আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ৬৩টি পাথরের ভাস্কর্য।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

পাহাড়পুর বিহার

নির্মাণকাল ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা অনুসারে ভাস্কর্যসমূহকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- গুপ্ত যুগীয় বৈশিষ্ট্যের ভাস্কর্য, অন্তর্বর্তীকালীন বৈশিষ্ট্যের ভাস্কর্য ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ ভাস্কর্য।

রাধাকৃষ্ণ, যমুনা, বলরাম এবং শিব ও তার সঙ্গীদের মূর্তি চারটি হচ্ছে গুপ্ত যুগীয় বৈশিষ্ট্যের ভাস্কর্য। ধূসর বেলে পাথর এবং এক ধরনের নীলচে ব্যাসল্টে নির্মিত ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের সাথে সম্পর্কিত এ ভাস্কর্যসমূহ খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন।

দেহসৌষ্ঠব সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ্য মতবাদের দেবদেবীর ভাস্কর্যসমূহ অন্তর্বর্তীকালীন বৈশিষ্ট্যের ভাস্কর্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এগুলো খ্রিষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত। পাহাড়পুরের অধিকাংশ ভাস্কর্যই এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ধূসর বেলেপাথর ও ব্যাসল্ট পাথরে নির্মিত ইন্দ্র, শিব, অগ্নি ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্তি অন্তর্বর্তীকালীন বৈশিষ্ট্যের ভাস্কর্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

পাহাড়পুর বিহার

স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ এ ভাস্কর্যসমূহের মাধ্যমে বাংলার নিজস্ব রীতি এবং বাঙালির আটপৌরে জীবনধারার চিত্র ফুটে উঠেছে। এ ভাস্কর্যসমূহ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি, বুদ্ধের জীবনী, কৃষ্ণকাহিনি ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যসমূহ হচ্ছে অর্জুন বৃক্ষ উৎপাটনরত কৃষ্ণ, ত্রিভঙ্গ, নর্তকী, সুখী দম্পতি ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এ ভাস্কর্যসমূহ খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে নির্মিত। এ. কে. দীক্ষিত এ ভাস্কর্যসমূহকে বাংলার শিল্পকলার সবচেয়ে সজীব উদাহরণ বলে বর্ণনা করেছেন।

বাংলা ভাষার সৃষ্টিতেও এ পাহাড়পুর বিহারের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের রচনা এখানেই শুরু হয়েছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। পণ্ডিতদের মতে, সোমপুর বিহার তথা পাহাড়পুর বিহার ছিল চর্যাপদের কবিদের সাধন ক্ষেত্র। কাহ্নপা, কৃষ্ণপদ, কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণবজ্র প্রমুখ প্রাচীন বাঙালি কবিদের রচিত বৌদ্ধ গান দোহার বারটি গীত আজও বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

পাহাড়পুর বিহার

এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্রফলক। এদের মধ্যে বেশকিছু আমাদের দেশের জাদুঘরগুলো ছাড়াও অন্য দেশের জাদুঘরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনও মন্দিরের দেয়ালে প্রায় দুই হাজার চিত্রফলক সেঁটে আছে। এ চিত্রফলকগুলোতে তখনকার সময়ের মানুষের ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও ফুটে উঠেছে শ্রমজীবী মানুষের কঠোর জীবন সংগ্রাম ও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি। ফলকগুলোতে গ্রাম্য বধূ, কলসি কাঁখে রমণী, সন্তান কোলে জননী, লাঠি হাতে পথিক, লাঙল কাঁধে কৃষক ইত্যাদি দৃশ্য চিত্রায়নের মাধ্যমে তখনকার সময়ের গ্রামবাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া ফলকগুলোতে প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের বিভিন্ন চিত্রও ফুটে উঠেছে। লতাপাতা, পদ্মফুল, কলাগাছ, বাঘ, হাতি, মহিষ, শিয়াল, বানর, হরিণ, মাছ ইত্যাদির চিত্র এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এখানে বোধিসত্ত্ব, পদ্মপানি ও মঞ্জুশ্রীসহ নানা দেবদেবীর মূর্তি এবং গৌতম বুদ্ধের মূর্তি সংবলিত চিত্রফলকও পাওয়া গেছে। এ ফলকগুলোর মাধ্যমে তখনকার সময়ের গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের গভীর জীবনবোধ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সংবেদনশীলতার একটি সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠে।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

পাহাড়পুর বিহার

বিহারটির প্রাঙ্গণেই ছিল বিশাল রন্ধনশালা। এখানে ভোজনালয়, হলঘর, উপাসনালয়, বারান্দা ও কার্নিশযুক্ত ইমারত ছাড়াও ছিল পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা। এখানে কোনো কক্ষ বা উদ্যানে যাতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয় সেজন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি করা হয়েছিল ড্রেনেজ সিস্টেম। এখানে পানীয় জল সংগ্রহের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কুয়ো। উঁচু মঞ্চের মতো করে নির্মাণ করা হয়েছিল শৌচাগার। এখান থেকে পাকা নালা তৈরি করে তা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নদী পর্যন্ত। তখনকার সময়ে এত উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সত্যিই বিস্ময়কর। এখানেও পুণ্ড্রনগরের মতো নির্মাণকাজে পুরকৌশল ও স্থাপত্যবিদ্যার উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

এখানে খলিফা হারুন-অর-রশিদের মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ থেকে ধারণা করা হয়, মুসলমানদের আগমনের পূর্ব থেকেই এদেশের সাথে আরব দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এখানকার প্রাপ্ত অধিকাংশ মুদ্রা ষোড়শ শতাব্দীর বলে ধারণা করা হয়। মুদ্রা ছাড়াও এখান থেকে আরও বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেছে। প্রাচীন তাম্র শাসন, পোড়ামাটির ফলক, সিলমোহর, ছোট ছোট মাটির প্রদীপ, হাতিয়ার, রঙিন পাথরের গুটি, বুদ্ধের মাথার মূর্তি, শিলালিপি, ব্রোঞ্জ ও পাথরের মূর্তি, বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের আমলের মুদ্রা, মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত বিভিন্ন কড়ি এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সোমপুর বিহারের পূর্ব প্রাচীর থেকে প্রায় ৪০০ গজ পূর্বে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সত্যপীরের ভিটা নামে একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

পাহাড়পুর বিহার

এখানে ৮০ ফুট, ৪৮ ফুট আয়তনবিশিষ্ট প্রধান ধ্বংসাবশেষ গন্ধেশ্বরীর মন্দির রয়েছে। এটিই এখানকার প্রধান মন্দির। এর সামনের অংশে রয়েছে স্তম্ভযুক্ত হলঘর, পিছনের উত্তরাংশে রয়েছে পুজোর স্থান। মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে এ পর্যন্ত ১৩২টি নিবেদন স্তূপ পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৫ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি স্তূপও রয়েছে। এছাড়া এখান থেকে বৌদ্ধ মতবাদ খোদাই করা গোল সিল, অলঙ্কৃত ইট, লাল-সবুজ-বেগুনি-সাদা রঙের সংমিশ্রণে ফুল ও লতাপাতার নকশা আঁকা পাত্রখণ্ড, আট হাতবিশিষ্ট বৌদ্ধদেবী শীতাপত্ত তারার মূর্তি, ব্রোঞ্জের মূর্তি, পোড়ামাটির ফলকচিত্র ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে।

উত্তর ভারতীয় প্রতিহার নামীয় ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ অনুসারী রাজবংশের শাসনামলে এ বিহারটিতে প্রথম আক্রমণ পরিচালিত হয়। সর্বশেষ একাদশ শতকের শেষদিকে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এ বিহারটি বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ্য মতানুসারী সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এ শতাব্দীতেই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য মতানুসারী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এ বৌদ্ধবিহার থেকে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য প্রত্যাহার করা হয়। তাছাড়া তখন এ মহাবিহারের জ্ঞানার্থী শিক্ষার্থীরাও এদেশে বৌদ্ধধর্মের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সময় বিহার ছেড়ে চলে যায়। এভাবেই ধীরে ধীরে এটি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয় এবং বন-জঙ্গলে ভরে যায় পরিত্যক্ত এ বিহারটি।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

পাহাড়পুর বিহার

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পাহাড়পুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এখান থেকে উদ্ধারকৃত ধ্বংসাবশেষের সবগুলোর সঠিক পাঠোদ্ধার আজ অবধি সম্ভব হয়নি। তারপরও যতটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকেই বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে এগুলোর অবদান খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এখান থেকে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ তখনকার সময়ের মানুষের নির্মাণকাজে পুরকৌশল ও স্থাপত্যবিদ্যায় উৎকর্ষকে ফুটিয়ে তোলে। তাছাড়া এগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তথা সামগ্রিক জীবনধারা সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা পাওয়া যায়।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

ময়নামতি

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: বাংলাদেশে মানবসভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি নিদর্শন হচ্ছে কুমিল্লার ময়নামতি। প্রাগৈতিহাসিককালেই এখানে জনবসতি শুরু হয়েছিল। এখান থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেরও আগের অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ বছর আগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিপুল পরিমাণ প্রাচীন কীর্তি ছড়ানো আছে এ এলাকায়। ময়নামতি লালমাই পাহাড় ছাড়াও দেবিদ্বার, চান্দিনাসহ সমগ্র কুমিল্লাই বহন করছে এদেশে মানবসভ্যতার বিকাশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এখানকার মাটির নিচে লুকিয়ে আছে অনেক রাজা-মহারাজার রাজধানী, নগর-মহানগর, বড় বড় বিদ্যানিকেতন, উপাসনালয়, সুউচ্চ অট্টালিকা ইত্যাদি।

অবস্থান ও নামকরণ: কুমিল্লা জেলা শহর থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে ময়নামতির অবস্থান। এখানে উত্তর-দক্ষিণে ১১ মাইলব্যাপী ময়নামতি-লালমাই পাহাড়ি অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ১১ মাইলব্যাপী এ পাহাড় শ্রেণির উত্তরাংশের নাম হচ্ছে ময়নামতি। ময়নামতি গ্রামের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় এ গ্রামের নামানুসারে পাহাড় এলাকাটির নাম হয়েছে ময়নামতি। পাহাড়ের দক্ষিণাংশের নাম হচ্ছে লালমাই। যার শব্দগত অর্থ লালমাটির পাহাড়।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

ময়নামতি

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলি ও এগুলোর গুরুত্ব: ময়নামতি লালমাই এলাকা থেকে প্রাপ্ত দালানকোঠার ধ্বংসাবশেষগুলো হচ্ছে বৌদ্ধবিহার, ছোটবড় বৌদ্ধস্তূপ বা মন্দির এবং দুর্গ বা আবাসগৃহ। এখানে প্রাচীন আমলের বিভিন্ন দিঘিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এখান থেকে প্রাপ্ত দিঘিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আনন্দ রাজার দিঘি, ভোজ রাজার দিঘি, শালবন রাজার দিঘি, লাল দিঘি, জয় মাঠের দিঘি ইত্যাদি। এছাড়া এ এলাকার উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ময়নামতি প্রাসাদ বা দুর্গ, ভোজ রাজার বাড়ি, ইটাখোলা মুড়া, চারপত্র মুড়া, কুটিলা মুড়া, বৈরাগী মুড়া, রূপবান মুড়া, আদিনা মুড়া ইত্যাদি।

শালবন বিহারটি আবিষ্কৃত হয়েছে কুমিল্লা শহর থেকে পশ্চিমে পাহাড়ের পূর্ব সীমা ঘেঁষে শালবনপুর গ্রামের নিকটে। প্রাচীন এ বিহারটির প্রকৃত নাম এখনও জানা যায়নি। ৫০০ ফুট বাহুবিশিষ্ট বর্গাকৃতির এ বিহারটি সমতটের দেববংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এ বিহারটির কেন্দ্রস্থলে একটি মন্দির ছিল। এখানে ছাত্রদের থাকার কাজে ব্যবহৃত ১২ × ১২ ফুট মাপবিশিষ্ট ১১৫টি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্গাকৃতির বিহারটিকে ১৬ ফুট প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছিল।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

ময়নামতি

বই-পুস্তক, দোয়াত-কলম, মূর্তি ইত্যাদি রাখার জন্য কক্ষগুলোর দেয়ালে সেঁটে আছে তিনটি করে কুলুঙ্গি। ছাত্রাবাসের কক্ষগুলোর সামনে রয়েছে দেয়াল দিয়ে ঘেরা ৮ ফুট প্রশস্ত বারান্দা। এর দেয়ালে সেঁটে আছে চমৎকার সব পোড়ামাটির ফলক। বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আবিষ্কৃত হয়েছে চার স্তম্ভবিশিষ্ট বর্গাকৃতির একটি হলঘর। ভোজনশালা হিসেবে ব্যবহৃত হতো এ হলঘরটি। এটির সংলগ্ন কক্ষগুলোতে রন্ধনশালাও পাওয়া গেছে। তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কেন্দ্রীয় মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩টি গোলাকার স্তম্ভের ওপর একটি তিন কোনা মন্দিরের নিদর্শনও খুঁজে পেয়েছেন।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

ময়নামতি

শালবন বিহার থেকে ৩ মাইল উত্তরে ময়নামতি সেনানিবাস এলাকায় আবিষ্কৃত হয়েছে 'কুটিলা মুড়া' নামক অসাধারণ একটি পোড়াকীর্তি। এখানে আবিষ্কৃত ত্রিরত্ন স্তূপটি বৌদ্ধধর্মের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথা বুদ্ধ বা জ্ঞান, ধর্ম বা ন্যায় এবং সঙ্ঘ বা শৃঙ্খলার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এ স্তূপগুলোর মাধ্যমে খুব সহজেই অনুমান করা যায়, এখানে একসময় বৌদ্ধধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতির খুব প্রভাব ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এ ধরনের স্থাপত্যকীর্তি ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোথাও পাওয়া যায়নি। তাছাড়া এখানে একটি বর্গাকার বেদির উপরে রয়েছে গোলাকার ড্রামের আকারে নির্মিত বেশ কয়েকটি স্তম্ভ। এ স্তম্ভগুলোর উপরে ছিল অর্ধগোলাকার গম্বুজ। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এ গম্বুজের শীর্ষে সুদৃশ্য চূড়া ছিল। ত্রিরত্ন স্তূপের দুপাশে পাওয়া গেছে গভীর গর্তসহ আরও দুটি ইটনির্মিত স্তূপ। ত্রিরত্ন স্তূপের পশ্চিমে আবিষ্কৃত হয়েছে আরও নয়টি স্তূপের ভিত্তি। এখানে প্রদক্ষিণ পথসহ একটি বড় হলঘর এবং প্রশস্ত সিঁড়িরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, সিঁড়িযুক্ত তিনটি প্রবেশপথ সংবলিত বিরাট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এ কুটিলা মুড়ার মাটির নিচে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ চাপা পড়ে আছে।

কুটিলা মুড়া থেকে দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ভূমি থেকে ৩৫ ফুট উঁচুতে একটি পাহাড়ের শীর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি চার কোনা বৌদ্ধমন্দির। এ কীর্তিটির নাম হচ্ছে চারপত্র মুড়া।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

ময়নামতি

লালমাই পাহাড়ের উত্তর সীমায় ভূমি থেকে ৪০ ফুট উঁচুতে আবিষ্কৃত হয়েছে বিরাট প্রাচীরসহ ইমারতের ধ্বংসাবশেষ। এ এলাকা থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটিই ধর্মচর্চার সাথে সম্পর্কহীন বলে ধারণা করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকের এ ধ্বংসাবশেষটি ছিল রানী ময়নামতির প্রাসাদ বা দুর্গ। এর পূর্বদিকের নিচু ভূমিতে ছিল বড় দিঘি।

শালবন বিহার থেকে ২ মাইল উত্তরে সেনানিবাসের ভিতরে অবস্থিত আনন্দ বিহার। স্থানীয় লোকজন এটিকে বলেন আনন্দ রাজার বাড়ি। আকারে এটি শালবন বিহারের চেয়েও অনেক বড়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এটি খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে দেববংশীয় বৌদ্ধ রাজা আনন্দ দেব কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটির গায়ে সেঁটে আছে বিভিন্ন চিত্রফলক। বিহারটির উত্তর-পূর্বদিকে আবিষ্কৃত হয়েছে আনন্দ রাজার দিঘি। এছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এ বিহারের সামান্য পশ্চিমে বৈরাগীর মুড়াসহ বৌদ্ধ আমলের আরও অনেক পুরাকীর্তির নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

ময়নামতি

এ অঞ্চলের অন্যতম পুরাকীর্তি রূপবান মুড়ার অবস্থান হচ্ছে ইটাখোলা মুড়ার দক্ষিণে এবং কোটবাড়ী থেকে সামান্য পশ্চিমে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখান থেকে সাড়ে আট ফুট লম্বা অভয় মুদ্রায় দণ্ডায়মান একটি বৌদ্ধমূর্তির সন্ধান পেয়েছেন। এদেশের বড় ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে প্রাচীন। এ এলাকা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে অসংখ্য প্রত্নসম্পদ। এগুলোর মাধ্যমে আমরা তখনকার সময়ে এ অঞ্চলের মানুষের মেধা, দক্ষতা, রুচিশীলতার পরিচয় পাই। এখান থেকে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদের মধ্যে পোড়ামাটির ফলকচিত্র, আটটি গুরুত্বপূর্ণ তাম্র শাসন, পদ্মপানি, জম্ভুল, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, প্রজ্ঞাপারমিতা ও মঞ্জুশ্রীসহ ১৫০টির বেশি দেবদেবীর ব্রোঞ্জের মূর্তি, পাথরের তৈরি মূর্তি, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলের স্বর্ণমুদ্রা, আব্বাসি খলিফা মুত্তাসিম বিল্লাহর মুদ্রা, সিলমোহর, সোনা-রুপা ও ব্রোঞ্জের তৈরি আংটি, কানের ফুল, হাতের চুড়ি ইত্যাদি অলঙ্কার, রূপার টুকরা, কড়া, বর্শি, খননযন্ত্র, দা, ছুরি, কাঁচি, লোহার পেরেক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রস্তর যুগের ছুরি, বাটালি এবং অন্যান্য হাতিয়ার হচ্ছে এ এলাকায় প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন ও মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের অবদান

ময়নামতি

ময়নামতির উন্নত সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হিসেবে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিহ্ন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্জাগরণের সময় এর ওপর থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে ধীরে ধীরে এটি ধ্বংসের দিকে পতিত হয় এবং পরিণামে জনশূন্য হয়ে পরিণত হয় এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে। এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ তখনকার সময়ের এ অঞ্চলের মানুষের অগাধ মেধা, প্রজ্ঞা ও রুচিশীলতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই বাংলাদেশে মানবসভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে এ এলাকার অবদানকে আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ১০ বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

টপিক ১০: বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভাবক হচ্ছে মানুষ। যেদিন মানুষ পৃথিবীর মাটিতে প্রথম বিচরণ করেছিল সেদিনই রোপিত হয়েছিল সভ্যতার বীজ। সভ্যতা হলো বাহ্যিক, যান্ত্রিক ও বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। যা সংস্কৃতির অধিকতর জটিল এবং অগ্রগতির ফল। বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার ভিতর দিয়ে মানুষ অগ্রসর হয়েছে সামনের দিকে, একই সাথে সভ্যতারও বিকাশ ঘটেছে সমান্তরালভাবে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা আজ বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির এক উন্নত সভ্যতায় বসবাস করছি। কিন্তু এ পৃথিবী আজকে যেই অবস্থানে আছে সেই অবস্থানে আসতে সময় লেগেছে কয়েক হাজার বছর। বর্তমান সভ্যতায় পদার্পণের ক্ষেত্রে মানবসমাজকে অনেক ধাপ বা স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার অবদান বা প্রভাব রয়েছে। এদের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা, ব্যবিলনীয় সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, সাপটেমীয় সভ্যতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার পটভূমি: আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক কাঠামো রূপায়ণে সিন্ধু সভ্যতার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা ওই স্থানে বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে মনে করে খননকাজ শুরু করেন। এ খননকাজে তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়।

সমসাময়িককালে ১৯২২ সালে ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিদ ডি. আর. সাহনী-এর প্রচেষ্টায় হরপ্পায় প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। ১৯২৪ সালে স্যার জন মার্শাল পশ্চিম ভারতের (বর্তমান পাকিস্তান) মহেঞ্জোদারোতে এ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ উদ্‌ঘাটন করেন। জওহরলাল নেহেরু তার 'The Discovery of India' নামক গ্রন্থে সিন্ধু সভ্যতার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি সিন্ধু সভ্যতার জনগোষ্ঠীর সাথে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মিল লক্ষ করেছেন।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

এটি মিসরীয়, ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় সভ্যতার সমসাময়িক। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রাচীন এ সভ্যতাটি। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মন্টোগোমারি জেলার হরপ্পা এবং সিন্ধুর মহেঞ্জোদারো সভ্যতাই ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। হরপ্পা থেকে প্রায় ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মহেঞ্জোদারো। সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত বলে এ সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা বলে অভিহিত করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব চার হাজার অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব আড়াই হাজার অব্দ পর্যন্ত ছিল এ সভ্যতার স্থায়িত্বকাল। তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা অধ্যুষিত এ অঞ্চলকে। যথা- হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো এবং চানহুন্দারো। প্রায় ১৫০০ মাইল জুড়ে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে গড়ে ওঠে এ সভ্যতা। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মাধ্যমে এ সভ্যতার অনেক কীর্তি ও রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। তবে খননকার্যের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শনেরই সঠিক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এমনকি কোন মানবগোষ্ঠী কর্তৃক এ সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কারও মতে দ্রাবিড় আবার কারও মতে আর্য।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত কঙ্কাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে তাদের প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, ভূমধ্যসাগরীয়, মঙ্গোলয়েড ও আলপাইন নৃগোষ্ঠীভুক্ত করেছেন। জন মার্শালসহ অনেক পণ্ডিত মনে করেন, দ্রাবিড় নামক জনগোষ্ঠী এ সভ্যতার পত্তন করেছিল। অর্থাৎ আর্যদের আগমনের অনেক পূর্বেই এ সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটে। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, মহামারি, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে এ সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর্যরা ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছে খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে। সুতরাং দ্রাবিড়দের সাথে আর্যদের সংঘর্ষের কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় ঐতিহাসিক আর. সি. মজুমদারের মতে, দ্রাবিড়রা সিন্ধু সভ্যতার পত্তন করেছে।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার চিত্র ও বৈশিষ্ট্য

সিন্ধু সভ্যতার পত্তন কে বা কারা করেছিল তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ থাকলেও বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে এ সভ্যতার অবদানকে আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শিল্পকলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিমাপ পদ্ধতি, ভাষা ও লিপি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সিন্ধু নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ: নদীবিধৌত উর্বরা পলিতে কৃষি অর্থনীতি ছিল এ সভ্যতার জীবনীশক্তি। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ফলে সমাজে অবসর জীবনযাপনকারী শ্রেণি দেখা দেয়। সংস্কৃতি, শিল্পচর্চা তথা উন্নত জীবনবোধের উন্মেষ ঘটে। ফলে গড়ে ওঠে একটি পরিকল্পিত উন্নত নগর জীবন। সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা নির্ভর এবং তাতে দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। নগরের রাস্তাগুলো বেশ প্রশস্ত (৯ থেকে ৩৪ ফুট) এবং সেগুলো অনেক দূরের ব্যবধানের পরস্পরকে ছেদ করে আয়তাকার রূপ দিয়েছে। প্রশস্ত রাস্তা ছাড়াও ছিল ছোট ছোট গলি-রাস্তা। নগরের ভবনগুলো পোড়ানো শক্ত ইটের তৈরি। একটি স্বাস্থ্যকর নাগরিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গোসলখানা পয়ঃপ্রণালী তথা নর্দমার সুযোগ-সুবিধা বর্তমান ছিল। রাস্তায় নিয়মিত ব্যবধানে 'ল্যাম্পপোস্টের' ব্যবস্থা ছিল। সেখানে পৌরসভার অস্তিত্ব ছিল যা একটি উন্নত মানের প্রশাসন, রুচিবোধ, সাংস্কৃতিক তথা নগর সমাজজীবনের ইঙ্গিত বহন করে।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার চিত্র ও বৈশিষ্ট্য

বড় বড় প্রাসাদ, মাঝারি ও ছোট আকারের আবাসিক ভবনগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে সিন্ধু সভ্যতার সামাজিক স্তরের (ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র) একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আবাসিক ভবনগুলো উন্নত শিল্পমনের পরিচয় বহন না করলেও সেগুলোতে যাতে আরামে বসবাস করা যায় সেদিকে বেশি লক্ষ রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি বাড়িতে প্রশস্ত বারান্দা, দরজা-জানালা, কূপ, নর্দমা গোসলখানার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। নগরের অন্যতম আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে ১৮০ × ১০৮ ফুট আয়তনের 'গ্রেট বাথ' (Great Bath)। এর অভ্যন্তরে সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত যে 'সুইমিং পুলটি' ছিল তার দৈর্ঘ্য ৩৯, প্রস্থ ২৩ এবং গভীরতা ৮ ফুট। উভয় পাশে সিঁড়ি বিশিষ্ট এ সুইমিং পুলে পানি সরবরাহের জন্য একটি ভিন্ন পানির কূপ ছিল। চারদিকের প্রশস্ত বারান্দা ও গ্যালারি তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। গ্রেট বাথের নিকটেই ছিল ১৫০ × ৭৫ ফুট আয়তনের শস্যাগার। বহু স্তম্ভ বিশিষ্ট ৮০ বর্গফুট আয়তনের একটি ভবনের ধ্বংসাবশেষকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সভাকক্ষ (Assembly Hall) নামে চিহ্নিত করেছেন। এর ভিতরে বহু সংখ্যক নিচু বেঞ্চী ও চারদিকে প্রশস্ত বারান্দা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পার সর্ববৃহৎ ভবনকে (১৬৯ × ১৩৫ ফুট) বিখ্যাত শস্যাগার (great granary) বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরিমাপ ও ওজনের নির্দিষ্ট মানদণ্ড এবং খাজনা আদায় প্রথা চালু ছিল। আর তা প্রমাণ করে যে সিন্ধু সভ্যতায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার চিত্র ও বৈশিষ্ট্য

অর্থনৈতিক জীবন: সিন্ধু সভ্যতার অধিকাংশ জনগণ গ্রামে বাস করত এবং তারা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এখানে আবিষ্কৃত শস্যগোলা তাদের শক্ত কৃষি অর্থনীতির পরিচয় বহন করে। সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা গম, যব, বার্লি, শাকসবজি, তুলা, নানাবিধ বাদাম, খেজুর ইত্যাদি চাষ করত। তাম্রনির্মিত বড়শি আবিষ্কারের মাধ্যমে ধারণা করা হয়, তখনকার অধিবাসীরা মাছও শিকার করত। তাদের আরেকটি প্রধান পেশা ছিল পশুপালন। গরু, মহিষ, ভেড়া, হাতি, শূকর, ছাগল ইত্যাদি ছিল তাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায় বাণিজ্যেও সিন্ধু সভ্যতা বেশ উন্নতি করেছিল। স্থল ও জলপথে তারা ভারতের ভিতরে ও বাইরের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করত। মিশর, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, চীন ও এশিয়ার সমগ্র অঞ্চলের সাথে সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আবিষ্কৃত জাহাজ, নৌকার ধ্বংসাবশেষ, বৃহদাকার ঝিনুক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, এখানকার অধিবাসীরা সমুদ্র চলাচলেও অভ্যস্ত ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় তাঁতশিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল। তাছাড়া এখানে কাঠের হাতলবিশিষ্ট তামা ও ব্রোঞ্জের আয়না, হাতির দাঁতের সুচ, হাতির দাঁতের চিরুনি, মৃৎপাত্র, সিল ইত্যাদি নির্মাণের কারখানাও গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ শক্ত অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ওপর দণ্ডায়মান ছিল এ সিন্ধু সভ্যতা। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এ সিন্ধু সভ্যতারই দান। এখনও আমাদের গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পেশা হচ্ছে কৃষি। তখনকার তাঁতশিল্প বিকশিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে আজকের পোশাক শিল্প। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দ্রব্যাদির নির্মাণ কারখানা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে আজকে আন্তর্জাতিক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার চিত্র ও বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক ব্যবস্থা: গবেষকদের মতে, সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে সেকালে এখানে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠার আভাস পাওয়া যায়নি। কিন্তু হরপ্পা, কালি, বাঙ্গা ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত স্থাপনায় যেসব দুর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে পণ্ডিতগণ ধারণা করেন, নগরীর শাসনকর্তারা এসব দুর্গে বাস করতেন। এসব শহরকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করা হয়। প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল খাজনা আদায়। খাজনা আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় রাজশক্তিকে গড়ে তুলতে হয়েছিল একটি সুশৃঙ্খল রাজস্ব ব্যবস্থা ও রাজস্ব প্রশাসন। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে, সিন্ধু সভ্যতার প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন পুরোহিত রাজা। তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা। এখনও আমাদের বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রশাসনে আলাদা বিভাগ রয়েছে। যদিও তার গঠন কাঠামো ও কার্যপ্রক্রিয়ার সাথে তখনকার রাজস্ব প্রশাসনের কোনো মিল পরিলক্ষিত হয় না, তথাপি আমরা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের সুশৃঙ্খল, চিন্তাভাবনার প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারি না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে পুরোহিতের বদলে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার চিত্র ও বৈশিষ্ট্য

নগর পরিকল্পনা ও বৈচিত্র্য শ্রেণি: বিভিন্ন নিদর্শনের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, সিন্ধু সভ্যতায় নগরের বিকাশ ঘটেছিল। নগর পরিকল্পনার আবাসিক এলাকাগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে ধারণা করা হয়, এখানে বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। এখানে প্রাপ্ত সুরম্য প্রাসাদ, সাধারণ মানের ঘরবাড়ি এবং খুঁপড়ি ঘর তখনকার সময়ের উচ্চশ্রেণি ও মধ্যমশ্রেণির অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। উচ্চশ্রেণির মধ্যে ছিল অভিজাত; পুরোহিত, যোদ্ধা, চিকিৎসক, বণিক কারিগর, জাদুকর, জ্যোতিষী ইত্যাদি ছিল মধ্যমশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত আর কৃষক, শ্রমিক, জেলে, চর্মকার ইত্যাদি ছিল নিম্নশ্রেণির।

ধর্মীয় বিশ্বাস: সিন্ধু অঞ্চলে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের ভিত্তিতে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বলা যায়, এখানে দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করা হতো। দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিল শিব। বাঘ, মহিষ, হরিণ ও গণ্ডার পরিবেষ্টিত হয়ে উলং ত্রিমুখী, শিংধারী ধ্যানরত যে মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটিকেই শিবদেবতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তখন মাতৃদেবীর পূজাও করা হতো। তাছাড়া এখান থেকে দুর্গামূর্তিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলো ছাড়াও তখনকার সময়ে গাছ, পাথর, নদী, পশু, লিঙ্গ ইত্যাদির পূজাও করা হতো। তাত্ত্বিকদের মতে, তখনকার সময়ে মানুষ পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করত। বর্তমানে আমাদের দেশে হিন্দু সম্প্রদায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে থাকে। তাছাড়া তারা পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করে। বর্তমান হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সে সময়ের সিন্ধু অঞ্চলের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবকে তাই খাটো করে দেখা যায় না।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার চিত্র ও বৈশিষ্ট্য

শিল্পকর্ম : সিন্ধু অঞ্চলে তখনকার সময়ের মানুষের বহু শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিভিন্ন প্রাণীর ছবি তাদের শিল্পকর্মে এবং চিত্রাঙ্কন প্রণালিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান দখল করে আছে। সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে ষাঁড়, হাতি, বাঘ, হরিণ, গণ্ডার, গরিয়াল, কুমির ইত্যাদি ছবি সংবলিত অনেক সিলমোহর পাওয়া গেছে। এছাড়া এ অঞ্চলে কাস্তে, ছুরি, হাড় ও হাতির দাঁতের তৈরি চিরুনি, কারুকার্যখচিত সুন্দর ডিজাইনের মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির খেলনা, তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি কুঠার, মাস্তুলবিহীন জাহাজের চিত্র, স্বর্ণ, রোপ্য, তাম্র, ব্রোঞ্জ ও ঝিনুকের অলঙ্কার, নৃত্যরত নারী ও পুরুষের মূর্তি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সিন্ধুবাসীর উন্নত শিল্পকলা, কারুশিল্প ও সৌন্দর্যবোধের স্বাক্ষর বহন করে। বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে কারুকার্যসমৃদ্ধ নিখুঁত শিল্পের নির্মাণ এখনও অব্যাহত রয়েছে। কারুশিল্পের প্রতি এদেশের মানুষের এখনও প্রচণ্ড আকর্ষণ রয়েছে। তাই বাংলাদেশে শিল্পকলা ও চিত্রকর্মের বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ সততা। পরীক্ষা দেবেশী টা বৌভাতা ভোলা

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার চিত্র ও বৈশিষ্ট্য

পরিমাপ পদ্ধতি: সঠিক পরিমাপের উদ্দেশ্যে সিন্ধুবাসীরা উদ্ভাবন করেছিল ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতির। এজন্য তারা বিভিন্ন আকৃতির ও ওজনের বাটখারা ব্যবহার করত। সিন্ধু অঞ্চলে প্রাপ্ত সবচেয়ে ছোট বাটখারা ছিল ৮৭৫ গ্রাম এবং সর্ববৃহৎ বাটখারাটি ছিল ১০.৯৭০ গ্রাম ওজনের। বড় বড় দ্রব্য ওজনের জন্য ব্যবহৃত হতো ব্রোঞ্জের স্কেল। কোনো জিনিসের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য স্কেল ব্যবহার করা হতো। সিন্ধু অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত স্কেলটির দৈর্ঘ্য ছিল ২০.৬২ ইঞ্চি। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন দ্রব্যের ওজন পরিমাপের জন্য বাটখারা ব্যবহৃত হয় এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন আকৃতির ফিতা বা স্কেল, যা সিন্ধু সভ্যতার পরিমাপ সংস্কৃতিকেই নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার চিত্র ও বৈশিষ্ট্য

জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশে অবদান: জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সিন্ধু সভ্যতা যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। তবে কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল তার সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পণ্ডিতগণ মনে করেন, তারা পাটিগণিত, জ্যামিতি, ধাতুবিদ্যা ও রসায়ন বিজ্ঞানে জ্ঞান অর্জন করেছিল। ওজন পরিমাপের জন্য বাটখারা ও দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য স্কেল ব্যবহার তাদের গাণিতিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। বহুতল অট্টালিকা নির্মাণ, নির্দিষ্ট ব্যবধানে ল্যাম্পপোস্ট স্থাপন, রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ, নগর পরিকল্পনা ইত্যাদি তাদের জ্যামিতিক জ্ঞানের স্বাক্ষর রাখে। ধাতু শিল্পেও তারা যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছিল। ব্রোঞ্জ ও ইলেক্ট্রাম তৈরির ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। রসায়ন শাস্ত্রেও তারা পারদর্শী ছিল। বিটুমিনের ব্যবহার এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের নকল পুঁতি তৈরির কৌশল আয়ত্ত রসায়ন শাস্ত্রে সিন্ধুবাসীর ব্যুৎপত্তি অর্জনের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমানে বাংলাদেশে পাটিগণিত, জ্যামিতি, ধাতুবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও এগুলোর অগ্রগতিতে সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার প্রসার ও প্রভাব

সিন্ধু সভ্যতা ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। এ সভ্যতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-১. মহেঞ্জোদারো, ২. হরপ্পা ও ৩. চানহুন্দারো। সরস্বতী শতদ্রু উপত্যকা থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃতি ছিল এ সভ্যতা এবং প্রায় ২৪১৩ কিলোমিটার জুড়ে তা বিকশিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পর একাধিক খননকার্যের ফলে স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। (যথা- মান্তা জেমনু জেলা) পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত রূপড়, চণ্ডীগড়, রাজস্থানের অন্তর্গত কালিবাঙ্গান; হিসার জেলার অন্তর্গত বনওয়ালি দৌলতপুর ও মিটাথাল; উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত আলমগীরপুর এবং গুজরাটের অন্তর্গত কুচ জেলা। বর্তমানে গুজরাটের কুচ অঞ্চলে বুজ শহরের কাছে ঢোলারীরাতে ৫০ হেক্টর অঞ্চল জুড়ে একটি দুর্গবেষ্টিত শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ঢোলারীরাতে খ্রিষ্টপূর্ব ২৯০০ সাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল পর্যন্ত এ সময়ে যেসব প্রত্নসামগ্রী নির্দেশিত হয়েছে তা থেকেই এ সভ্যতার উন্মেষ, বিকাশ ও অবলুপ্তির সব দিকগুলোর নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার প্রসার ও প্রভাব

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন আর্য সভ্যতার পূর্বেও সে দেশে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তার প্রমাণ মেলে। তবে একটি ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা হওয়ায় এর খুব বেশি বিকাশ ঘটেনি। সিন্ধু সভ্যতা কেবল মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা সিন্ধুর অন্যান্য অঞ্চল যেমন হায়দ্রাবাদ থেকে জ্যাকিবাদ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এছাড়া পশ্চিম ভারতসহ বেলুচিস্তানের উত্তর ও পশ্চিম এলাকা জুড়ে এ সভ্যতার প্রসার ও প্রভাব ঘটেছিল। উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাটনা ইত্যাদি অঞ্চলে প্রাপ্ত পুঁতির মালা ও চিত্র পদ্ধতির ধ্বংসাবশেষ থেকে মনে হয় সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব ছিল ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে। সিন্ধু সভ্যতার মানুষ তথা দ্রাবিড়দের সামাজিক প্রথা ও ধ্যানধারণা আর্যরা অনুকরণ করেছিল। এমনকি হিন্দুধর্মের মৌলিক ধারণার কিছু অংশ সিন্ধু সভ্যতা থেকে গৃহীত। ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদিতে এ সভ্যতার প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে অনেকের ধারণা বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, ঝড়, সাইক্লোন, ভূমিকম্প ও মহামারির ফলে এক সময় সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটে।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার বিলুপ্তি

ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অথবা ১৪০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। হঠাৎ করেই সিন্ধু সভ্যতার পত্তনের সুনির্দিষ্ট কারণ এখন অস্পষ্ট। তবে জলবায়ুর পরিবর্তন বা অন্যকোনো জনগোষ্ঠীর আক্রমণে এ সভ্যতার পতন ঘটে বলে অনুমান করা হয়। এ সময়কালের কোনো দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া যায় না। স্টেইনের (Aurel Stein) মতে, তাম্র যুগ থেকেই সিন্ধু উপত্যকা ও এর কৃষি জমি সাদা ও শুষ্ক হয়ে উঠেছিল। একে অনেকেই সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ বলে মনে করেন। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের জন্য একাধিক কারণ দায়ী। বিভিন্ন পণ্ডিতেরা সিন্ধু সভ্যতা পতনের কতকগুলো সম্ভাব্য কারণের উল্লেখ করেছেন। যেমন-

ক. মহামারি, বন্যা, প্লাবন ও ভূমিকম্প (প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেন যে ২৭৫০ খ্রিষ্টপূর্ব প্রলয়ঙ্করী বন্যায় সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটেছে)।

খ. বহিঃশত্রুর আক্রমণ (আর্যদের আক্রমণ)।

গ. অভ্যন্তরীণ সংকট।

ঘ. মাটির উর্বরতা হ্রাস ও অবক্ষয়।

ঙ. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন।

চ. গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়া, বন উজাড় ও মরুকরণ।

ছ. ভৌগোলিক আকার সংক্রান্ত পরিবর্তন।

বাংলাদেশের সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার অবদান

সিন্ধু সভ্যতার বিলুপ্তি

মার্টিনার হুইলারের মতে, সিন্ধু সভ্যতায় অর্থনৈতিক অবক্ষয় ছিল স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয়, নাগরিক জীবন ও জীবনবোধ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় এবং নগরগুলো ধ্বংসের মুখে পড়ে। উল্লেখ্য যে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ছিল অনিশ্চিত বাস্তুসংস্থানের ওপর নির্ভরশীল, যা সহজেই নিশ্চিহ্ন হতে পারে। সিন্ধু সভ্যতার এ অবক্ষয়ে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার সভ্যতার প্রাথমিক যুগের পতন ঘটে। পরবর্তীকালে ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে গাঙ্গেয় উপত্যকায়। গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত এ সভ্যতা পারসিক সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ১১ অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

টপিক ১১: অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> প্রত্নতত্ত্ব

প্রত্নতত্ত্ব নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা। প্রত্নতত্ত্ব হচ্ছে অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক পাঠ। প্রত্নতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য হলো প্রাচীনকালের মানুষের ইতিহাস খুঁজে বের করা। কঙ্কাল বা জীবাশ্মের মধ্যে এমন অনেক সূত্র বা রহস্য থাকে, যা অতীতকালের মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর এ কাজটি প্রত্নতাত্ত্বিকরা গবেষণার মাধ্যমে সম্পন্ন করে। প্রত্নতত্ত্ব বলতে সেই বিজ্ঞানকে বোঝায়, যা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লষণের মাধ্যমে প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানদান করাকে বোঝায়।

> প্রত্নতাত্ত্বিক যুগবিভাগ

প্রতাতত্ত্বের সময়কালের ওপর ভিত্তি করে মানব সমাজকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-১. প্রাচীন প্রস্তর যুগ ২. নব্য প্রস্তর যুগ ৩. ব্রোঞ্জ যুগ ৪. তাম্র যুগ ৫. লৌহ যুগ। লিখন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে মানব সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- পাথরের যুগ ও ধাতুর যুগ। প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ হলো পাথরের যুগ। ব্রোঞ্জ যুগ, তাম্র যুগ ও লৌহ যুগ হলো ধাতু যুগ।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> প্রাচীন প্রস্তর যুগ

সভ্যতার সূচনা হয়েছিল প্রাচীন প্রস্তর যুগে। পাথরের যুগের প্রথম যুগটি হলো প্রাচীন প্রস্তর যুগ। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘতম যুগ হচ্ছে প্রাচীন প্রস্তর যুগ। এ যুগটি আজ থেকে ২৫ লাখ বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল ১০ হাজার বছর পূর্বে। এ যুগের প্রধান অধিবাসী ছিল নিয়ানডারথাল ও ক্রোম্যাগনন মানুষ। ভূমিহীনরা এ যুগকে প্লাইসটোসিন বলেছেন। যে যুগে মানুষ অমসৃণ ও ভোঁতা পাথরের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করে পশুপাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত তাকে প্রাচীন প্রস্তর যুগ বলে। প্রাচীন প্রস্তর যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ এবং উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ। এ যুগে মানুষ প্রথম পাথরে পাথর ঘষে আগুন আবিষ্কার করে কিন্তু আগুনের সঠিক ব্যবহার জানত না। এ যুগের মানুষ যাযাবর ছিল। খাদ্য সংগ্রহ ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। খাদ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে বিভিন্ন হাতিয়ার উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয় এ যুগের মানুষ।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> নব্য প্রস্তর যুগ

খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ অব্দে মধ্যপ্রাচ্যে নব্যপ্রস্তর যুগের সূচনা হয়। সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে নব্যপ্রস্তর যুগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ ধাপ হচ্ছে নব্য প্রস্তর যুগ। গর্ডন চাইল্ড এ যুগকে 'নবোপলীয় যুগ' বা 'নবোপলীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন। নব্যপ্রস্তর যুগে প্রথম কৃষির সূচনা হয়। যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী বসবাস শুরু করে এ যুগে মানুষেরা। তারা পশুকে বশে এনে পশুপালন করতে শেখে। এ যুগেই প্রথম ব্যবসায় বাণিজ্য ও বিনিময় প্রথার প্রচলন শুরু হয়। এ যুগের গুরুত্বপূর্ণ বড় আবিষ্কার হলো চাকা। আগুনের ব্যবহারও এ যুগের মানুষেরাই আয়ত্ত করেছিল। পরিবার প্রথার উৎপত্তিও এ যুগে প্রথম ঘটেছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিল নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষেরা।

> ব্রোঞ্জ যুগ

প্রথম ব্রোঞ্জ যুগে নগরসভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল মিশর ও মেসোপটেমিয়াতে। প্রস্তর যুগের শেষে ধাতু যুগের সূচনা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ৩০০০ অব্দের মধ্যে মিশর, ভারত, সেমোপটেমিয়া ও চীনে ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হয়েছিল, যা ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। টিন ও তামার সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হতো। ব্রোঞ্জ যুগে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। ব্রোঞ্জ যুগের হাতিয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- শিরস্ত্রাণ, বর্শা, তলোয়ার, তীরধনুক ইত্যাদি।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> তাম্রযুগ

নব্যপ্রস্তর যুগ ও ব্রোঞ্জ যুগের মাঝামাঝি সময়ে তাম্রযুগের আবির্ভাব ঘটে। যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র তৈরির শক্ত উপাদান ছিল তামা। তাম্র যুগের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো হলো- গাড়িতে পশু শক্তির ব্যবহার, কুমারের চাকা, লাঙল, পাল তোলা নৌকা ইত্যাদি।

> লৌহ যুগ

তাম্র যুগের শেষদিকে লৌহ যুগের সূচনা ঘটে। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সর্বোচ্চ স্তর হলো লৌহ যুগ। এশিয়ার মাইনরে বসবাসরত হিট্রাইটরা সর্বপ্রথম লৌহের ব্যবহার শুরু করে। লৌহ যুগকে আধুনিক সভ্যতার যুগ বলা হয়। লৌহ যুগের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো- যানবাহন তৈরি, ঘরবাড়ি নির্মাণ, রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ, কলকারখানা, শিল্পকলা ও স্থাপত্য, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিগত কাজ ইত্যাদি।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> উয়ারী-বটেশ্বর

উয়ারী-বটেশ্বর দুটি গ্রামের বর্তমান নাম। নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় অবস্থিত এ দুটি গ্রাম। ছাপাকৃত রৌপ্যমুদ্রার প্রাপ্তি স্থান হিসেবে পরিচিত উয়ারী-বটেশ্বর গ্রাম দুটি। ২০০০ সালে আনুষ্ঠানিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি দল প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু করে। এখানে আড়াই হাজার বছরের পুরোনো নগর সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে। উয়ারী-বটেশ্বরের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো- রূপার নৌকা, মাছ ও সূর্যের ছাপা মুদ্রা, পাথরের পুঁতি, লোহার হস্ত কুঠার, চাকু, শিব নৈবেদ্যপাত্র, রোলেটেড মৃৎপাত্র, বর্শা, তীরের মাথা, ব্রোঞ্জ অশ্ব ও গরু, পোড়ামাটির নিক্ষেপনাস্ত্র, পোড়ামাটির ফলক ইত্যাদি। উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধধর্মীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

>মহাস্থানগড়

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি হলো বাংলাদেশের মহাস্থানগড় বা পুণ্ড্রনগর। গুপ্তপাল, হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার এক সমৃদ্ধ নগরী হলো মহাস্থানগড়। বগুড়া জেলা শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে এবং মহাস্থানগড় থেকে ২ কিলোমিটার দক্ষিণে মহাস্থানগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটির অবস্থান। এখানে আবিষ্কার হয়েছে শীলাদেবীর ঘাট, পরশুরামের প্রাসাদ, বৈরাগী ভিটা, গোবিন্দ ভিটা ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> শীলাদেবী

শীলাদেবী হলেন মহাস্থানগড়ের সর্বশেষ হিন্দু নৃপতি পরশুরামের কন্যা। তিনি ছিলেন পরমা সুন্দরী। রাজা পরশুরামের পরাজয় ঘটে মাহীসাওয়ারের কাছে। বন্দি করা হয় শীলাদেবীকে। শীলাদেবী নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য আত্মবিসর্জন দেন করতোয়া নদীতে। সেই থেকে করতোয়া নদীর এ স্থানটির নাম শীলাদেবীর ঘাট হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

> পাহাড়পুর বিহার

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রাজশাহীর নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় পাহাড়পুর বিহার অবস্থিত। এটি প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন। পাহাড়পুর বিহারের অন্য নাম হলো সোমপুর বিহার। পাল বংশের দ্বিতীয় শাসক রাজা ধর্মপাল অষ্টম শতাব্দীতে বরেন্দ্রভূমিতে সোমপুর নামক স্থানে পাহারপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। পাহাড়পুরের আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সোমপুর বিহার, গন্ধেশ্বরীর মন্দির, পোড়ামাটির ফলক, টেরাকোটার ফলক, শিলালিপি, মুদ্রা, সীলমোহর ইত্যাদি।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> সিন্ধু সভ্যতা

ভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রাচীন সভ্যতা হলো সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতা মূলত নগর সভ্যতা। সিন্ধু নদের তীরে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই এর নামকরণ হয় সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতা নদী বেষ্টিত হওয়ায় এ সভ্যতার মূল শক্তি ছিল কৃষি অর্থনীতি। সিন্ধু সভ্যতায় বেশ কিছু ছবিযুক্ত সিলমোহর পাওয়া গেছে। সেগুলো হলো- বাঘ, ঘোড়া, কুমির, হরিণ, হাতি ইত্যাদি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ১২ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ১

ছক-১	ছক-২
ভোঁতা ও অমসৃণ হাতিয়ার	ধারালো ও মসৃণ হাতিয়ার
খাদ্যের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল	কৃষি উৎপাদনের সূচনা
যাযাবর জীবন	স্থায়ী বসতি

ক. কৃষির উৎপত্তি হয়েছিল কোন যুগে?

খ. শালবন বিহার- ব্যাখ্যা কর।

গ. ছক-১ এ বর্ণিত যুগের সমাজজীবন বর্ণনা কর।

ঘ. ছক-২ এ বর্ণিত যুগের আবিষ্কারসমূহ সমাজ পরিবর্তনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? মূল্যায়ন কর। (ঢা. বো. '২৩; রা. বো. '২৩; ব. বো. '২৩; ম. বো. '২৩

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ২- বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে গড়ে উঠা ঢাকা যার প্রাচীন নাম জাহাঙ্গীর নগর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে এই নগর উন্নত জীবনযাপনের অনুপযোগী। অথচ ভারতীয় উপমহাদেশে অতীতে নদী তীরবর্তী এলাকায় যে নগরগুলো গড়ে উঠেছিল তা ছিল অত্যন্ত পরিকল্পনা নির্ভর। নগরগুলোতে নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ছিল।

ক. কোন যুগে পশুপালন অর্থনীতির সূচনা হয়?

খ. ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে কোন ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে কোন সভ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শহরের সমস্যা সমাধানে সমাজবৈজ্ঞানিক জ্ঞান কীভাবে সহায়তা করতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

[য. বো. '২৩; কু. বো. '২৩, চ. বো. '২৩; সি. বো. '২৩ঃ দি. বো. '২৩]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ৩- শফিক গত ঈদের ছুটিতে নরসিংদীতে বেড়াতে গিয়ে বেলাব থানা সদর থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পরিদর্শন করেছে।

ক. মহাস্থানগড় কোন জেলায় অবস্থিত?

খ. লৌহকে কেন আধুনিক যুগের ভিত্তি বলা হয়? বুঝিয়ে দাও।

গ. উদ্দীপকে শফিকের পরিদর্শনকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কোনটি? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনায় উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

[রা. বো '১৮; কু. বো '১৮; চ. বো '১৮; ব. বো '১৮]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩– প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

টপিক – ১৩ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. প্রত্নতত্ত্ব হলো- [সকল বোর্ড '২৩]

ক. সমাজ ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন
খ. সমাজ ও সভ্যতার অধ্যয়ন
গ. উন্নত সংস্কৃতির অধ্যয়ন
ঘ. প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির অধ্যয়ন

২.আদিম সমাজে ব্যবহৃত তৈজসপত্রাদি কিসের নিদর্শন? (সকল বোর্ড '১৯)

ক. দার্শনিক
খ. নৃতাত্ত্বিক
গ. প্রত্নতাত্ত্বিক
ঘ. অর্থনৈতিক

৩. প্রত্নতত্ত্ব কী? সকল বোর্ড '১৮, ১৬]

ক. অতীত সমাজের বিবরণ
খ. অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত পাঠ
গ. সংস্কৃতি সম্পর্কিত পাঠ
ঘ. অতীত ঘটনাবলির বিবরণ

৪. বিলুপ্ত সংস্কৃতির অধ্যয়নকে বলে-

ক. মনোবিজ্ঞান
খ. রসায়ন বিজ্ঞান
গ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ঘ. প্রত্নতত্ত্ব

৫.প্রত্নতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

ক. জানা সত্য থেকে অজানা সত্যে গমন করা
খ. প্রাচীনকালের মানুষের ইতিবৃত্ত খুঁজে বের করা
গ. নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা
ঘ. মানবসভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেওয়া

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. কিসের ওপর ভিত্তি করে মানব সমাজকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়?
ক. সমাজ বা যুগের ওপর
খ. মানব সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ওপর ভিত্তি করে
গ. জীবিকা উপার্জন বা কৌশলের ওপর ভিত্তি করে
ঘ. প্রত্নতত্ত্বের সময়কালের ওপর ভিত্তি করে
৭.প্রত্নতত্ত্বের কল্যাণে-(সকল বোর্ড '২২]
i. সমাজ বিবর্তনের ধারণা পাওয়া যায়
ii. ধর্মীয় অনুভূতির পরিচয় জানা যায়
iii. অর্থনৈতিক কার্যাবলির ধারণা মেলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৮. ইংরেজি 'Lithos' শব্দের অর্থ কী?

ক. পুরাতন খ. পাথর গ. পাঠ ঘ. স্থাপত্য

৯. প্রস্তর যুগের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ কোনটি?

ক. প্রাচীন প্রস্তর যুগ খ. মাধ্যমিক পর্যায়

গ. শেষ পর্যায় ঘ. নব্য প্রস্তর যুগ

১০. প্রাথমিকভাবে প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময়কাল কত ধরা হয়েছিল?

ক. খ্রিষ্টপূর্ব পনেরো লক্ষ থেকে দশ লক্ষ অব্দ পর্যন্ত

খ. খ্রিষ্টপূর্ব বিশ লক্ষ থেকে পঁচিশ লক্ষ অব্দ পর্যন্ত

গ. খ্রিষ্টপূর্ব ত্রিশ লক্ষ থেকে বিশ লক্ষ অব্দ পর্যন্ত

ঘ. খ্রিষ্টপূর্ব ষোল লক্ষ থেকে দশ লক্ষ অব্দ পর্যন্ত

১১. প্রাচীন প্রস্তর যুাকে কয়টি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে?

ক. তিনটি খ. চারটি গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১২. জাভা মানব কোন দেশে পাওয়া যায়?

ক. চীনে খ. জাপানে গ. মালয়েশিয়া ঘ. ইন্দোনেশিয়া

১৩. কোন যুগের মানুষের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না?

ক. ব্রোঞ্জ যুগ খ. মধ্য প্রস্তর যুগ

গ. নব্যপ্রস্তর যুগ ঘ. লৌহযুগ

১৪. মাধ্যমিক যুগের উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীর নাম কী?

ক. গোর্খা খ. নিয়ানডারথাল

গ. শিখ ঘ. ক্ষত্রিয়

১৫. প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য বাসিন্দা

ক. নিয়ানডারথাল খ. পিথেক্যানপাস

গ. ক্রোম্যাগনন নরগোষ্ঠী ঘ. আটলান্টপাস

THANK YOU